আদমের আদি উৎস

আল মেহেদী

আদমের আদি উৎস

www.pathagar.com

আদমের আদি উৎস

আল মেহেদী

প্রকাশনায়
পলাশ পাবলিকেশন
২৩৯ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

আদমের আদি উৎস
– আল মেহেদী

ISBN 984-32-0908-7

প্রকাশক
মুহাম্মদ আক্কাস উদ্দীন
পলাশ পাবলিকেশন
২৩৯ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশক
আহসান পাবলিকেশন
■ ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
■ ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
■ কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০৩
আশ্বিন ১৪১০
শাবান ১৪২৪

প্রচ্ছদ : এম জি এ আলমগীর

মুদ্রণ
মীম প্রিন্টার্স
নীলক্ষেত, ঢাকা-১০০০

কম্পোজ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১০০০

মূল্য : একশত টাকা মাত্র

ADAMER ADI UTHSHA by AL MEHEDI Published by PALASH PUBLICATION, 239 Elephant Road, Dhaka-1205 First Edition October, 2003 Price Tk. 100.00 only ($ 2.00)

www.pathagar.com

ভূমিকা

হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া পৃথিবীর প্রথম খেলাফতধারী মানব-মানবী। তাদের আগে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে মানুষের কোন প্রজাতি পৃথিবীতে আসেনি।

যেহেতু, তাঁরাই পৃথিবীর প্রথম খেলাফতধারী মানব-মানবী, সেহেতু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তাঁরা কোন উৎস ধরে পৃথিবীর মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন? এ প্রশ্নের গতানুগতিক অনেক ব্যাখ্যা ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু ধর্ম ও বিজ্ঞানের সে সব তথ্য পরস্পর বিরোধী ও সংঘাতময়। এতে আপামর জনতার ক্ষেত্রে যাচাই বাছাই করে সঠিক ও নির্ভুল তথ্যটি খুঁজে বের করে বিশ্বাস করা কঠিন। তাই আজ ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের মূল উৎসটি কোথায় তা খুঁজে বের করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এটি বের করতে পারলেই আদম ও হাওয়া কোন উৎস ধরে পৃথিবীতে এসেছিলেন, তা জানা যাবে বলে আশা করা যায়।

আমার লেখা "আদমের আদি উৎস" বইটিতে কোন্ উৎস ধরে আদম ও হাওয়া পৃথিবীর মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন, তার ধর্ম ও বিজ্ঞানের তথ্য ভিত্তিক নতুন গবেষণাধর্মী "যুক্তি তথ্য" তুলে ধরা হয়েছে। এসব "যুক্তি তথ্য" ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তব ভিত্তিক প্রমাণের মাধ্যমে অতীতের সকল দ্বন্দ্বের মূল উৎপাটন করে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সহঅবস্থান গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

যেহেতু বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর তাই আমার "যুক্তি তথ্যই" যে একশত ভাগ নির্ভুল তা আমি দাবী করছিনা। আমার যুক্তি তথ্য যাদের বুঝতে অসুবিধা হয়, তাদের ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের দলিলই যথেষ্ট। পাশাপাশি উচ্চ মানের আলেম, ওলামাগণের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।

পরিশেষে আমার ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে পরবর্তি সংস্করণের জন্য নতুন নতুন তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন, এটাই প্রিয় পাঠকবৃন্দের কাছে আমি দাবী রাখছি।

বিনীত
আল মেহেদী
গ্রন্থকার

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. প্রাসঙ্গিক কথা ৭
২. মহাবিশ্বের আদি সূচনা ৯
৩. ক্রোমোজম, জিন, জেনেটিক রূপান্তর ২২
৪. জেনেটিক বিলুপ্তি ২৫
৫. জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং ও মানব ক্লোনিং ২৮
৬. বিবর্তনবাদ ও মানুষ ৩২
৭. প্রাকৃতিক নির্বাচন ও উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন ৩৫
৮. বিবর্তনবাদ : অতীত ও বর্তমান চিন্তা ৪২
৯. জীবের আদি উৎসের সাথে পানির সম্পর্ক ৪৬
১০. পানির জীব ও স্থলের জীবের সম্পর্ক ৪৯
১১. মানুষ সৃষ্টিতে পানির প্রকারভেদ ৫২
১২. মানুষ সৃষ্টিতে মাটির গুরুত্ব ৫৬
১৩. আদমের পূর্ব প্রজাতির মানুষের ইতিহাস ৬০
১৪. আধুনিক বিবর্তনবাদ ৬৭
১৫. আল কোরআনে বন্য মানুষের বিলুপ্তির ইতিহাস ৭১
১৬. আদম ও হাওয়ার জন্ম রহস্য ৭৪
১৭. আদম হতে তাঁর সঙ্গীনী সৃষ্টির প্রসঙ্গ ৯০
১৮. বিতর্ক ও সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর ৯৭
১৯. আল্লাহর আদি অবস্থান ১১১
২০. রূহ বা আত্মার পরিচয় ১১৭
২১. আদম সম্পর্কে ফিরিশতাদের অবহিত করার কারণ ১২২
২২. ফিরিশতাদের অস্তিত্ব ও তাদের জ্ঞানের পরিধি ১২৫
২৩. আদমকে নাম শিক্ষা দেয়ার মর্মার্থ ১৩২
২৪. জিন ও শয়তানের অস্তিত্ব ১৩৬
২৫. আদমের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রাচীন কালের প্রচলিত ধারণা ১৪৬
২৬. বিবর্তন কেন ১৫৩
২৭. আদম (আ) ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের পরীক্ষা ১৫৮
২৮. মানুষ ও মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি ১৬১
২৯. উপসংহার ১৭২
৩০. শেষ কথা ১৭৪

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক কথা

পৃথিবীতে আদমের আবির্ভাব সত্যিই রহস্যজনক। এ কারণে যে, তিনি ছিলেন পৃথিবীর আদি মানব এবং তাঁর সঙ্গীনি বিবি হাওয়া ছিলেন আদি মানবী। তাঁদের পিতা-মাতার কোন উৎস কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না বলে তাদেরকে পৃথিবীর আদি মানব-মানবী বলা হয়। এক্ষেত্রে তাদের জন্ম পিতা-মাতা ছাড়াই হয়েছে, এরূপ ধারণা পোষণ করা হয়। কিন্তু এ ধারণাটি বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনের দিক থেকে কতটুকু নির্ভরযোগ্য তা তলিয়ে দেখা এখন যুগ-জিজ্ঞাসার অনিবার্য দাবী। কারণ "আদমের আদি উৎস" নিয়ে বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে ধর্মের দ্বন্দ্ব এখনও কাটেনি। গবেষণাহীন ধর্মীয় ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে, আদম-হাওয়া পৃথিবীর আদি মানব-মানবী। দুনিয়াতে তাদের কোন পিতা-মাতা ছিল না। আবার বিজ্ঞান বলছে বিবর্তনের মাধ্যমে জীব-প্রজাতির অন্য প্রাণী থেকে মানুষের (আদম ও হাওয়ার) উদ্ভব ঘটেছে। অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্মের মানুষ এমন এক জীব প্রজাতি থেকে উদ্ভব হয়েছে, যাদের জীবন প্রণালী ছিল মানুষের জীবন ধারার একেবারে কাছাকাছি। এর ফলে ধর্মে বিশ্বাসীগণ বিজ্ঞানের যুক্তি মেনে নিতে পারছেন না। তারা মনে করছেন বিজ্ঞানের তথ্য স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার শামীল।

এখানে বলা আবশ্যক যে, গবেষণাহীন ধর্মীয় ব্যাখ্যার কোন কোন বইয়ে (আদম ও শয়তান) লেখা হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মাটি দিয়ে আদম ও হাওয়াকে বানানো হয়েছে। এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আদৌ কোরআন হাদিসের মাধ্যমে স্বীকৃত কিনা তা আমরা তলিয়ে না দেখেই বিশ্বাস করে আসছি। কিন্তু আমি কোরআন হাদীস তালাশ করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মাটি দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন কোন তথ্য কোথাও খুঁজে

www.pathagar.com

পাইনি। তবে মানুষকে কাদা মাটির বিশুদ্ধ সারভাগ থেকে গঠন করা হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। (সূরা মু'মিনুন ২৩ : আয়াত ১২)

কোরআন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কি প্রক্রিয়ায় কাদা মাটির সারভাগ থেকে পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব ঘটেছে তা এ বইয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা যখন বলি, করিম রহিমের ছেলে, তারপর বলি রহিম রমজানের ছেলে। এভাবে প্রত্যেকের পিতার উৎস খুঁজে পেলেও আদম (আ) এর ক্ষেত্রে তাঁর পিতার অস্তিত্বের বেলায় শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এখানে এসে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না বিধায় বলা হয় আদম (আ) পিতা-মাতা ছাড়াই পৃথিবীতে এসেছিলেন। কিন্তু পিতা-মাতা ছাড়া কিভাবে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন ? তিনি কি আকাশ থেকে সিঁড়ি বেয়ে পৃথিবীর মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন ? নাকি এপোলো-১১ দিয়ে যেভাবে তিন নভোচারী চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন, সেভাবেই এসেছিলেন ? নাকি মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরী করে আদমকে বানানো হয়েছে ? এসব প্রশ্নের উত্তর খুবই স্পর্শকাতর। কারণ উত্তরটি এমন হতে হবে যাতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা থাকে।

আদম (আ) যে পৃথিবীতে বাস করতেন, সে পৃথিবীতে আমরাও বাস করছি। এ পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের কোন কিছুই একদিন ছিল না। মহাপদ্মকাল আগে কোন এক অজ্ঞাত সময়ে শূন্য থেকেই আজকের মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল। তাই আদমের জন্ম ইতিহাসের পিতৃশূন্যতা আর শূন্য থেকে মহাবিশ্বের সূচনা সবই ঐশী শক্তির (আল্লাহর ইচ্ছা শক্তির) বহিঃপ্রকাশ। এক্ষেত্রে মহা বিশ্বের আদি সূচনার সাথে আদম সৃষ্টির ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে আমাদেরকে আদমের আদি উৎস সম্পর্কে জানতে হলে মহাবিশ্বের আদি সূচনার দিকে ফিরে যেতে হবে।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের আদি সূচনা

বর্তমানে আমরা মহাবিশ্বকে যে রকম দেখছি, অনাদিকাল থেকেই কি মহা বিশ্বের অবস্থা এমন ছিল? এ প্রশ্ন বিবেকবান মানুষের মনকে কখনো যে নাড়া দেয়নি এমন নয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ মহাবিশ্বের আদি অবস্থা নিয়ে ভেবে আসছে। সে ভাবনার আধুনিক ফসল বিগ ব্যাংগ বা মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব। এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা হলো পরম শূন্য সময়ে মহাবিশ্বের কোথাও বস্তু ও সময় বলতে কোন কিছুই ছিল না। তখন ছিল না ভর-শক্তির কোন অস্তিত্ব। এ অবস্থায় মহাবিশ্বের সর্বত্রই ছিল পরম শূন্যতা আর শূন্যতা। এমন শূন্য পরিবেশে সময়ের চাকা ছিল স্থির। অর্থাৎ তখন মহাবিশ্বের কোথাও গতির সূচনা হয়নি। তাই ছিল না তখন ক্ষয়-মৃত্যুর খেলা। ছিল না খাওয়া-দাওয়া পয়ঃনিষ্কাশনের তাড়া। এমন অজ্ঞাত সময়ে পরমস্থিতিশীল মহাবিশ্বের কোন এক অজ্ঞাত অতি সূক্ষ্ম বিন্দুতে বিপুল পরিমাণ শক্তির সমাবেশ ও ঘনায়ন ঘটে। সে সময়ের বিশ্বটা ছিল অতি সূক্ষ্ম বিন্দুর ন্যায়। যা কিনা প্রোটন কণার চেয়েও কোটি কোটি গুণ ছোট। কালক্রমে সেখানে ঘটে এক মহা বিস্ফোরণ।

এখন প্রশ্ন হলো যেখানে ভর-শক্তির কোন অস্তিত্বই ছিল না, সেখানে কোন উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তির সমাবেশ ও ঘনায়ন ঘটল ? যারা বিগ ব্যাংগ তত্ত্বের রূপকার তারা এর জবাবে বলে থাকেন "দৈবক্রমে" ভর-শক্তির আবির্ভাবের কথা। মূলত তারা সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টার হাত আছে, এ কথা মানতে রাজি নন। তাই আমি সৃষ্টির আদি সূচনা বিগ ব্যাংগ-এর মাধ্যমে হয়েছে এ কথা মেনে নিতে পারছি না। আমি সৃষ্টির সূচনার ক্ষেত্রে এমন এক বিবর্তন বিশ্বাস করি, যা হলো স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন। পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও জীবের ক্ষেত্রে যেমন সাংগঠনিক বিবর্তন ধারায় ধাপে ধাপে সেগুলো উন্নতর শিকড়ে পৌঁছেছে, তেমনি জগতের আদি সূচনা থেকে তার পূর্ণতা পর্যন্ত আসতে অনেক ধাপ পার হতে হয়েছে।

www.pathagar.com

পরমশূন্যতা থেকে জগতের আবির্ভাব ঘটানো জাদুর বিষয় নয়। এটা সম্ভব হয়েছে সাংগঠনিক বৈজ্ঞানিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নিম্নে স্রষ্টার সেই সাংগঠনিক বৈজ্ঞানিক বিবর্তন প্রক্রিয়াটি তুলে ধরা হলো।

স্রষ্টা আদিতে ছিলেন পরমশূন্যতার মাঝে গুপ্ত। তখন মহাবিশ্বে ছিল পরম স্থিতি অবস্থা। ফলে তখন ভর-শক্তি ও সময়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কারণ গতিহীন ভর-শক্তি ও সময়ের কোন অস্তিত্ব থাকে না।

[পরম স্থিতির শূন্য সময়ে আল্লাহ জগতে ছিলেন গুপ্ত এবং তিনিই জগতের গুপ্তধন।]

কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন দার্শনিকগণ বস্তুর উপাদান ও গতিকে আদ্যান্তহীন মনে করত। ফলে তাদের বিশ্বাস ছিল বস্তুর উপাদান ও গতি আদিকাল থেকেই বিরাজ করছে। এখানে গতিহীন যেমন বস্তু হতে পারে না,তেমনি বস্তুহীন গতির কোন অস্তিত্ব থাকে না। আবার গতিহীন সময়েরও সূচনা হয় না। তাই বস্তু, গতি ও সময় সম্পর্কযুক্ত। আবার গতির ক্ষেত্রে শুরু ও শেষ বলে একটা নিয়ম আছে। এটা যখন প্রমাণ হলো তখন পূর্বের ধারণা পাল্টে যায়। অতঃপর তারা বিশ্বাস করতে লাগলো যে, বিশ্বের শুরুটা শূন্য থেকেই হয়েছে।

www.pathagar.com

মহা বিশ্বের পরম স্রষ্টা অনস্তিত্ব থেকেই এ বিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি বস্তুর উপাদানের যেমন স্রষ্টা তেমনি বস্তুরও স্রষ্টা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে বস্তুর অভ্যন্তর একেবারে শূন্য নয়। এদের অতিসূক্ষ্ম কণা পরমাণুর অভ্যন্তরের ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনেরও রয়েছে অতি সূক্ষ্ম নির্যাস। এর নাম কোয়ার্ক। এই কোয়ার্ক-এর পরবর্তিত রূপ হলো ফোটন। এভাবে বিভাজন করতে করতে-এর শেষ অবস্থানটি হলো "তথ্যকণা"। জগতের সমুদয় বস্তু হলো তথ্যকণার আধার। অপরদিকে প্রাণীর দেহগুলো চলমান তথ্যের ভাণ্ডার। ইট দিয়ে যেমন দালান তৈরী করা হয়, তেমনি তথ্যের সারি সাজিয়ে জীবদেহ তৈরী করা হয়েছে। এ তথ্য কোথেকে এলো? এগুলোর কি আপনা আপনি উদ্ভব ঘটেছে?

বিগ ব্যাংগ-এর ধারণা পোষণকারীগণ মনে করেন আদি মহাবিস্ফোরণের পর বিশ্ব অত্যন্ত গরম ছিল। সে সময় আণবিক নিউক্লিয়াসও উন্মুক্ত বিচরণকারী ইলেকট্রন দিয়ে তখনকার বিশ্ব গঠিত ছিল। এসব বিক্ষিপ্ত রেডিয়েশন একটা অগ্নি-গোলক থেকে আকাশের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এগুলোই কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। তারা আরও মনে করেন-মহাবিশ্ব যখন দ্রুত গতিতে ঠাণ্ডা হতে থাকে, তখন আণবিক নিউক্লিয়াস এবং মুক্ত ইলেকট্রন-এর মধ্যে টানা হেঁচড়া কমতে থাকে এবং অবশেষে আণবিক নিউক্লিয়াই মুক্ত ইলেকট্রনকে নিজ কক্ষ পথে স্থাপিত করে। তারপর কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন বা ফোটনগুলো মুক্ত ইলেকট্রনের মধ্যেই চিরস্থায়ীভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিগ ব্যাংগ এর ধারণা পোষণকারীগণ কিভাবে positive (ধ্বনাত্মক) ও Negative (ঋণাত্মক) চার্জ সৃষ্টি হলো সে ব্যাখ্যা দেননি।

পূর্বেই বলেছি, এখনও বলছি, আস্তিক হিসেবে আমি "মহাবিস্ফোরণের" মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা হয়েছে– একথা মনে করি না। বরং এ ক্ষেত্রে কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। আমরা যদি কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

করি তাহলে শূন্য থেকে জগৎ ও প্রাণীর উদ্ভব প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে যাব। এর জন্য দৈবের কোন আশ্রয় নিতে হবে না। তবে পরম স্রষ্টাকে জগতের আদি গুপ্তধন মেনে নিতে হবে।

পরম স্রষ্টা অসীম শূন্যতা ও পরম স্থিতিশীল বিশ্বে অনাদিকাল থেকে ছিলেন গুপ্ত অবস্থায়। কালক্রমে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইলেন। স্রষ্টা নিজকে পরিচিত করার পরম ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন। মানুষের ইচ্ছাশক্তি যেমন তরঙ্গের আকারে মস্তিষ্ক হয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তির ব্যগ্রতা মহাবিশ্বের পরম স্থিরতাকে প্রাথমিক পর্যায়ে তরঙ্গায়িত করে। এর ফলে জগৎ পরম গতি লাভ করে। আমার মতে সৃষ্টির আদি মুহূর্তে স্রষ্টার ইচ্ছা শক্তি প্রকাশের ব্যগ্রতায় পরম স্থিতির জগৎ-এ যে "মহাস্পন্দন" শুরু হয়, বিগব্যাংগ-এর ধারণা পোষণকারীদের দৃষ্টিতে এটাই মহা বিস্ফোরণ।

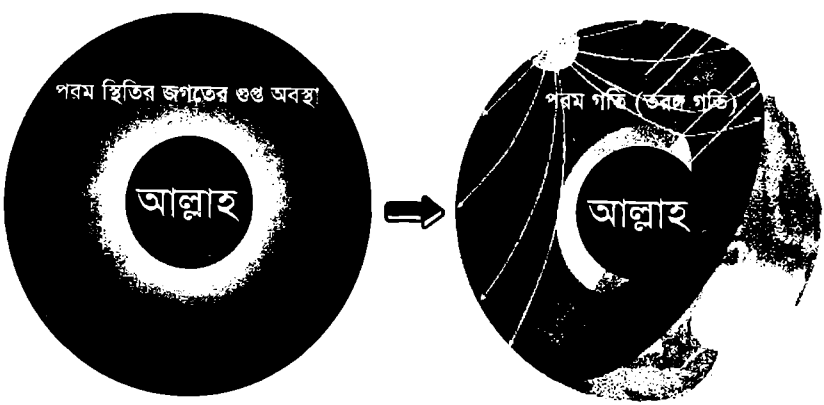

[A-এ সময় আল্লাহ ব্যতীত জগতে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তখন জগতে ছিল পরমস্থিতি। তাই জন-মানব, পদার্থ ও সময়ের অস্তিত্বহীন পরিবেশে স্রষ্টা ছিলেন গুপ্ত ও একাকি।

[B-এ পর্যায়ে স্রষ্টার মহামনের "মহাস্পন্দন" জগতকে করে পরমগতিশীল। অর্থাৎ জগৎ পরমস্থিরতা থেকে তরঙ্গ গতি লাভ করে এবং শূন্য মাধ্যম ফিরে পায় তরঙ্গ ধারণ করার ক্ষমতা। সে সময়ের তরঙ্গগতির জগতকে আমরা ব্রাকগ্রাউন্ড মাইক্রোওয়েভের জগতও বলতে পারি।

www.pathagar.com

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে-"আমি ছিলাম একটি গুপ্তধন। আমি প্রকাশ হতে চাইলাম, তাই সৃষ্টি করলাম এই সৃষ্টিকে। ইচ্ছা আমি পরিচিত হই।" (আল-হাদীস)

কোরআন মাজীদে আল্লাহ এরশাদ করেন- "তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা" (সূরা শূরা ৪২ : ১১)

"তিনি আদি ও তিনিই অন্ত; তিনি ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত।" (সূরা হাদীদ ৬ : ৩)

"আমি যে জিনিসের এরাদা করি সেজন্য শুধু এতটুকু বলতে হয় "হয়ে যাও" তাহলেই তা হয়ে যায়।" (সূরা আন নাহল ১৬ : আয়াত-৪০)

উপরোল্লিখিত হাদীস ও কোরআনের বাণী থেকে আমরা পরমশূন্য পরিবেশে স্রষ্টার অবস্থান, তাঁর প্রকাশ হওয়ার ইচ্ছার ব্যগ্রতা সম্পর্কে অবহিত হলাম। তিনি নিজেকে পরিচিত বা প্রকাশ করার জন্যই এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই এ জগৎ তাঁর প্রকাশের আবরণ। আল্লাহ 'হয়ে যাও" বললেই সব হয়ে যায়। এখানে "হয়ে যাও" বলার সাথে বস্তুর উপাদানের সম্পর্ক রয়েছে। স্রষ্টা কখনো মানুষের মতো মুখে শব্দ করে কথা বলেন না। এক্ষেত্রে তথ্যকণা প্রেরণ করে "কমান্ড-আদেশ"-এর মাধ্যমে মূল সিস্টেমটিকে কার্যক্রম করলেই বস্তু বা ঘটনাটি সৃষ্টি হয়ে যায়। বস্তুর মূল সত্তা হলো তথ্যকণা। সুতরাং "হয়ে যাও" বলা মানে তথ্য তরঙ্গ বা তথ্যকণা প্রেরণ। এখানে তথ্যটা হলো এরাদার বিষয়।

অর্থাৎ স্রষ্টা কি বানাতে চাচ্ছেন তা সংবাদ বা তথ্য। অতঃপর সে তথ্যটা যার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হলো সেটি হলো একটা তরঙ্গ বা ঢেউ। এ দু'টিকে একসাথে তথ্যতরঙ্গ বা তথ্যকণা বলা যায়। অতঃপর এক সময় "তথ্য-তরঙ্গ" "তথ্য কাঠামো" লাভ করে।

আমরা বস্তুর সূক্ষ উপাদানের মাঝে কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। যেমন প্রোটন ধ্বনাত্মক চার্জ বহন করে এবং ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জ বহন করে। আর নিউট্রন থাকে চার্জ নিরপেক্ষ। অপর দিকে নিউট্রিনো অন্যান্য

www.pathagar.com

কণাগুলোকে নিজের দিকে টানে। এদের মাধ্যমেই পরমাণু সৃষ্টি হয়। আবার অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয়ে অণু গঠিত হয়। এসব দিয়ে গঠিত প্রাণীদেহ লিঙ্গান্তরের বেলায় পুরুষ ও মহিলা রূপ ধারণ করে। মহাবিশ্বের সূচনার প্রাথমিক পর্যায়ে জগৎ-মহাজগৎ পরম গতি লাভ করলেও, সে সময় positive ও Negative চার্জ সৃষ্টি হয়নি। জগৎ-মহাজগতের রয়েছে দু'টি স্তর। একটি হলো আত্মিক জগৎ এবং অপরটি হলো বস্তু জগৎ। প্রাথমিক পর্যায়ে লিঙ্গান্তর শুরু হয় আত্মিক জগৎ থেকে। তারপর তা পর্যায়ক্রমে বস্তু জগতেও চলতে থাকে।

আমরা লিঙ্গান্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে ধরে নিতে পারি সুপার প্রোটন বা ধ্বনাত্মক তথ্য তরঙ্গ (positive information bit) এর কথা। এটি স্রষ্টার প্রত্যক্ষ (positive) অভিব্যক্তির বর্হিপ্রকাশ। ইংরেজীতে positive শব্দের একটি অর্থ হলো প্রত্যক্ষ। এ ধরনের প্রত্যক্ষ বা ধ্বনাত্মক তথ্য তরঙ্গে যে সব তথ্য ছিল সেগুলো হলো-চিন্তা, অনুভব ও স্মৃতি শক্তি। এর ফলে তার মাঝে ছিল অভাববোধ (সঙ্গিনী পাওয়ার ব্যাকুলতা) ও ইচ্ছাশক্তি প্রকাশের sensory ব্যবস্থাপনা (তথ্য আদান ও প্রদান করার গুণ)। Genatic code (জিন) যেমন তথ্য বহন করে, তেমনি ধ্বনাত্মক তথ্য তরঙ্গ এ সব তথ্য বহন করছিল।

জগৎ-মহাজগৎ পরম শূন্যতার পর ফিরে পায় পরম তরঙ্গ গতি। তারপর সেখানে সৃষ্টি হলো আ'রশ ও ফেরেশতার জগৎ। অতঃপর কালের চাকা ঘুরে সেখানে উদয় হলো ধ্বনাত্মক তথ্য তরঙ্গের মতো এক পরমসত্তা। যা স্রষ্টার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির বহি:প্রকাশ। এ সত্তা নি:সঙ্গ, নির্জন পরিবেশে বাস করতে থাকলে তার মাঝে উদয় হয় সঙ্গিনী পাওয়ার ব্যাকুলতা। এ ব্যাকুলতা বা সঙ্গিনী পাওয়ার অভাব বোধের তরঙ্গবার্তা যখন sensory ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে পৌঁছল, তখন স্রষ্টা ঐ ধ্বণাত্মক তথ্য তরঙ্গকে Command information bit (নির্দেশক তথ্য তরঙ্গ) দিয়ে

www.pathagar.com

আঘাত করান। এতে "ধ্বনাত্মক তথ্য তরঙ্গের" অস্তিত্ব থেকে পরোক্ষভাবে "ঋণাত্মক তথ্য তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটে।

"তোমরা ভয় কর সেই প্রভুকে যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সহধর্মিনীকে এবং সেই দুইজন (আদম এবং হাওয়া) থেকে তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা আন নিসা ৪ : আয়াত-১)

নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ায় যেমন পরমানুর নিউট্রন দিয়ে প্রোটনকে আঘাত করা হয় তখন মূল পরমাণুটি বিভক্ত হয়ে যায় এবং উত্তরোত্তর তার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময় তার থেকে কিছু শক্তির বিচ্যুতিও ঘটে। আদম থেকে হাওয়ার পয়দা এবং তার থেকে শয়তানের (কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি) সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়াটি অনেকটা এমনি একটা কৌশল। যখন ধ্বনাত্মক তথ্য তরঙ্গকে কমান্ড আদেশ (নির্দেশক তথ্য তরঙ্গ) দিয়ে আঘাত করা হয়, তখন ঋণাত্মক তথ্য তরঙ্গের উৎপত্তির পাশাপাশি কিছু 'বর্জ্য তথ্য তরঙ্গের' (শয়তানী সত্তার) উৎপত্তি ঘটে। এখানে 'ধ্বনাত্মক তথ্য তরঙ্গ', ঋণাত্মক তথ্য তরঙ্গ, নির্দেশক তথ্য তরঙ্গ (কমান্ড-আদেশ) ও 'বর্জ্য তথ্য তরঙ্গ' ইত্যাদির সাথে আদম (ধ্বনাত্মক সত্তা) হাওয়া (ঋণাত্মক সত্তা) ফেরেশতা (চার্জ নিরপেক্ষ সত্তা) ও শয়তানের সম্পর্ক রয়েছে। মূলত শয়তানের উৎপত্তি আদমের অস্তিত্ব থেকেই। পরবর্তী পর্যায়ে যখন ধ্বনাত্মক তরঙ্গ (+), ঋণাত্মক তথ্য তরঙ্গ (−) নির্দেশক তথ্য তরঙ্গ ও বর্জ্য তথ্য তরঙ্গ একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন বর্জ্য তথ্য তরঙ্গের গা জ্বলে জ্বলে ফোটন বা কোয়ান্টার উৎপত্তি ঘটে। মূলত এ ফোটন বা কোয়ান্টাই বস্তু জগতের মূল উপাদান। এর মাধ্যমেই পরমাণু গঠিত হয়। এখানেও রয়েছে ধ্বনাত্মক চার্জ (প্রোটন), ঋণাত্মক চার্জ (ইলেকট্রন), চার্জ নিরপেক্ষ সত্তা ও বর্জ্য তরঙ্গ। অত:পর এদের মাধ্যমে পদার্থ, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি, সৌরজগৎ এবং এভাবে পৃথিবীসহ সকল কিছুর উদ্ভব ঘটে।

www.pathagar.com

মূলত এ সবই সৃষ্টি হয়েছে স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন ধারায় ধাপে ধাপে। অতঃপর পৃথিবীতে এককোষী প্রাণীর আবির্ভাব। এখান থেকেই জীব জগতের রূপান্তর শুরু হয়। জীব জগতের রূপান্তরের প্রধান সত্তা হলো ক্রোমোজমের জিনগুলো। মূলত জেনেটিক রূপান্তরের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আদমের আবির্ভাব। কিন্তু আত্মিক পর্যায়ে আদমের উদ্ভব হয়েছে সৃষ্টির সূচনা থেকেই। অর্থাৎ আদমের আত্মিক উৎস থেকে বস্তু জগতের সকল উপাদানের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।

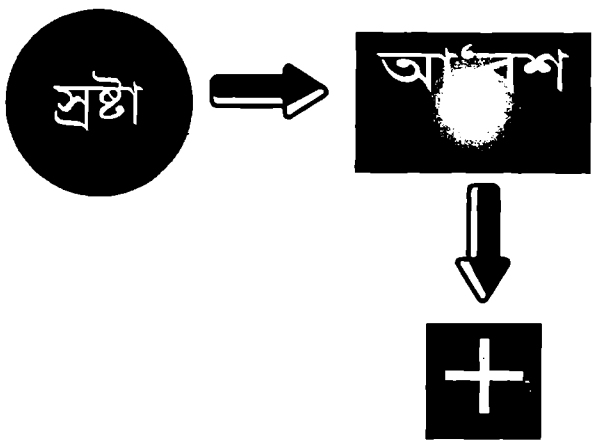

ধ্বণাত্মক তথ্য তরঙ্গ
(Positive information bit)

[পরম তরঙ্গগতির জগতে সৃষ্টি হয় আ'রশ বা মহা মস্তিষ্ক। অতঃপর তথ্য আদান-প্রদান করার মত গুণসম্পর্ণ যে সত্তার উদ্ভব ঘটে সেটিই positive information bit। এ সত্তা ধ্বনাত্মক (+) চার্জ বহন করে। পুনরায় এ সত্তা থেকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় অন্যান্য চার্জগুলোর উদ্ভব ঘটানো হয়]

আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম পদার্থ বিদ্যার জগতে সময়েরও মাত্রা আছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে দেশ-কাল ও সময় চিরন্তন নয় বরং আপেক্ষিক। অপর দিকে নিউটন চিন্তা করেছিলেন স্থান-কাল চিরন্তন। স্থান-কাল-চিরন্তন হলে একে বদলানো যেমন সম্ভব নয় তেমনি বলতে হয় পদার্থের আদি সত্তাও চিরন্তন। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্বের ধারণা থেকে বলা

www.pathagar.com

যায় পদার্থের আদি সত্তা ও সময়ের উৎপত্তি একই সময়ে হয়েছিল। এমন এক সময় ছিল যখন পদার্থের আদি সত্তা বলতে কিছুই ছিল না। তখন সময়েরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর সৃষ্টির সূচনায় পরমগতি ও সময়ের সূচনা হয়, তখন জগৎটা ভরে যায় কোয়ান্টা ও ব্রাকগ্রাউন্ড মাইক্রোওয়েভে। তাই বিজ্ঞানীগণ ফিরে যাচ্ছেন কোয়ান্টাম জগতের দিকে। তারা পদার্থের অভ্যন্তরে খুঁজে পেয়েছেন গতিশীল কোয়ান্টার অস্তিত্ব। কিন্তু কোন ভাবে যদি কোয়ান্টার গতিকে থামিয়ে দেয়া যায় তবে জগৎ হবে পরম স্থির ও শূন্য সময়ের। অর্থাৎ জগতে তখন আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। তাই বলা যায় আল্লাহ শূন্য থেকেই জগতের সকল কিছুর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন। মূলতঃ মহাবিশ্বের আদি অবস্থা এমনই ছিল। আজ বৈজ্ঞানিকগণ সে সত্য উৎঘাটনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছেন।

বিজ্ঞানী নিউটন থেকে নিয়ে অনেকেই আলোক শক্তিকে কণা হিসেবে বিবেচনা করতেন। পরে আলোক শক্তিকে ধরা হয়েছে দ্বৈত প্রকৃতি হিসেবে। যেমন আলোক কণা হিসেবেও থাকতে পারে আবার তরঙ্গ বা কোয়ান্টা হিসেবেও থাকতে পারে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি মুহূর্তকে যদি ইলেকট্রনের মতো সূক্ষ্ম মনে করা হয় তাহলে জগতের আদি অবস্থাটি ছিল কোয়ান্টাম অবস্থা। আবার জগতের সকল পদার্থের মূলে রয়েছে কোয়ান্টাম বা ফোটন। সে হিসেবে আত্মা কোয়ান্টা বা ফোটন পর্যায়ের চেয়েও সূক্ষ্ম কোন পরম সত্তা। যা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিভ ওয়েভ-এর ন্যায়।

এ সত্তা ফোটন চুম্বক তরঙ্গ ধরনের কোন কিছু। এতে রয়েছে ডি. এন. এ. কোডের মতো তথ্য ভান্ডার। এ ধরনের একমাত্র তথ্যকণা থেকেই জগতের সমুদয় আত্মা ও বস্তুর উপাদানের উৎপত্তি। নিম্নে সে চিত্রটি তুলে ধরা হলো।

www.pathagar.com

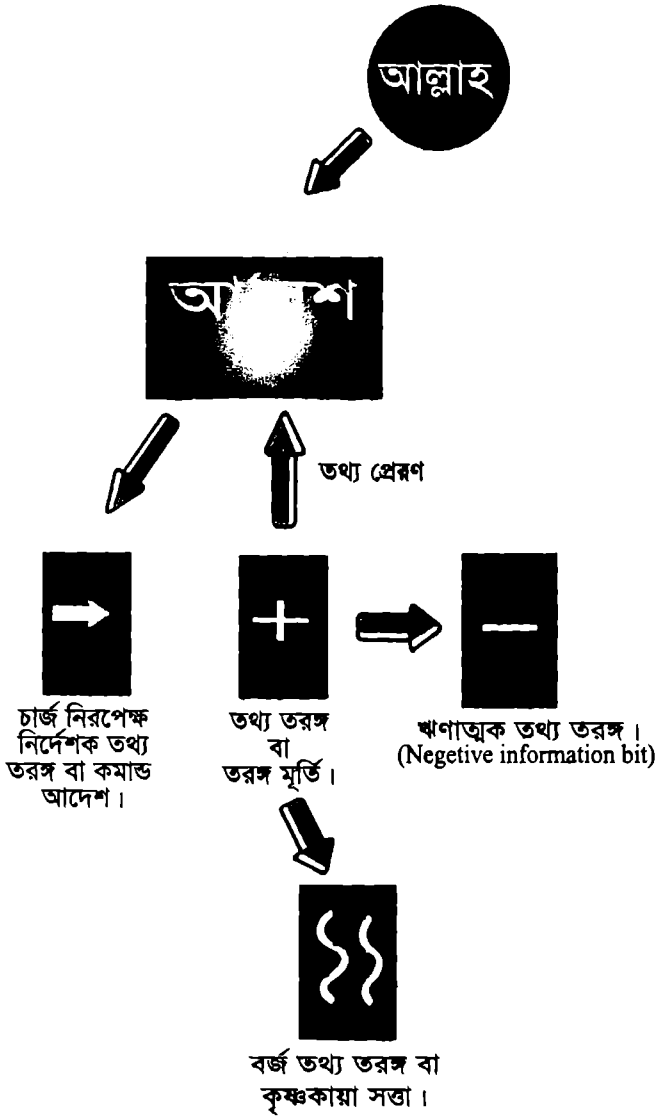

[চার্জ নিরপেক্ষ নির্দেশক তথ্য তরঙ্গ বা কমান্ড আদেশ ধনাত্মক (+) তথ্য তরঙ্গের গায়ে আঘাত করলে তার অস্তিত্ব থেকে ঋণাত্মক (–) তথ্য তরঙ্গ ও বর্জ্য তথ্য তরঙ্গের উদ্ভব ঘটে।]

www.pathagar.com

অতঃপর উক্ত তথ্য কণাগুলো পরম তরঙ্গগতির জগতে মুক্তভাবে বিচরণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে চারটি তথ্য কণাই পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে একটি বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর ফলে বর্জ্য তরঙ্গের গা জ্বলে জ্বলে উৎপন্ন হতে থাকে ফোটন বা কোয়ান্টা। এ ব্যবস্থাটি অনেকটা বৈদ্যুতিক বাল্বের মতো। এদের মাধ্যমে উৎপন্ন সূক্ষ্ম সত্তা বা তথ্য তরঙ্গের আধার পরম জাগতিক মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো থেকেই বস্তুর সূক্ষ্ম কাঠামো গড়ে ওঠে।

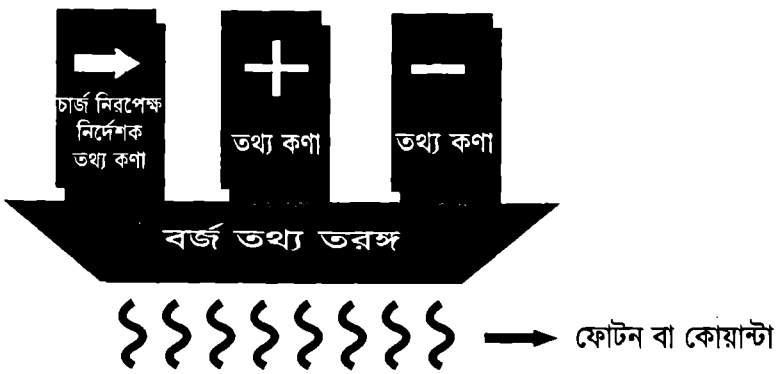

[উক্ত চারটি তথ্য তরঙ্গের আধার থেকে যে ফোটন বা কোয়ান্টার উদ্ভব হয় সেগুলোর মাঝেও ধনাত্মক, ঋণাত্মক, চার্জ নিরপেক্ষ ও বর্জ্য সত্তার গুণাগুণ বিদ্যমান থাকে। তবে পরিমাণ বা অনুপাতের কম-বেশী হতে পারে।]

পৃথিবীতে দেখা যায় জীবন রক্ষার উপযোগী সত্তা ও জীবন নাশক সত্তা একত্রে মিলে জীবন রক্ষাকারী উপাদান তৈরী করে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে লবনের কথা বলা যায়। লবন হলো সোডিয়াম ও ক্লোরিন গ্যাসের মিলিত যৌগিক উপাদান। এখানে ক্লোরিন জীবননাশক উপাদান আর সোডিয়াম জীবন রক্ষাকারী উপযোগী সত্তা। এ দু'টি সত্তা একত্রে মিলিত হয়ে জীবন রক্ষাকারী উপাদানে তৈরী হয়। তেমনি চারটি তথ্য কণার আধার একত্রে মিলিত হয়ে বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করে। এর নামই পরমাণু।

www.pathagar.com

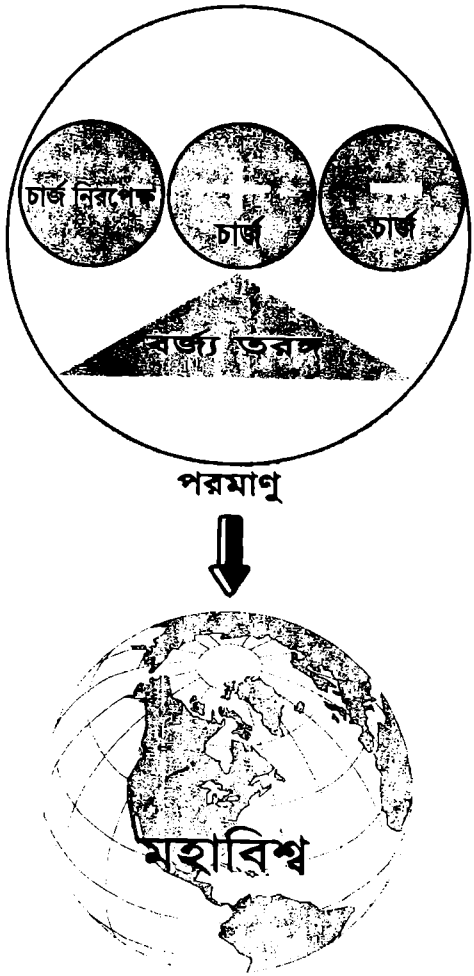

বর্তমানে পৃথিবীতেও আমাদের দেহকোষ থেকে এবং অন্যান্য বস্তু থেকেও আলোক উজ্জ্বল চুম্বক তরঙ্গ এবং কৃষ্ণকায়া শক্তি বিকিরণ হয়। কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ সত্তা হলো বর্জ্য সত্তা। এগুলো জাহান্নামের উপাদান। আর আলোক উজ্জ্বল চুম্বক তরঙ্গ জান্নাতের উপাদান। আগেও যেমন positive information bit থেকে Negative information bit ও বর্জ্য তরঙ্গ বের হয়েছিল ঠিক তেমনি দুনিয়াতেও আদম এবং তার প্রজন্মের সকল মানুষের দেহ সত্তা থেকে আলোক উজ্জ্বল চুম্বক তরঙ্গ এবং কৃষ্ণকায়া শক্তি বিকিরণ হয়।

www.pathagar.com

হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ রয়েছে, "আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আ) পয়দা করলেন, তাঁকে পয়দা করে তাঁর ডান কাঁধে করাঘাত করলেন, তারপর তাঁর সন্তানদেরকে বের করলেন, এরা এরূপ শুভ্র যেন মুক্তার মত উজ্জ্বল দুগ্ধ। তৎপর তিনি তার বাম কাঁধে করাঘাত করলেন এবং কৃষ্ণকায়া সন্তান বের করলেন, যেন তারা কাল কয়লা। তারপর তিনি তাঁর ডান হাতের সন্তানগণ সম্বন্ধে বললেন, এরা জান্নাতবাসী হবে আর তাতে কোন পরওয়া নেই। আর তাঁর বাম হাতের তালুস্থিত সন্তানগণ সম্বন্ধে বলিলেন, এরা জাহান্নামে যাবে, আর এ ব্যাপারে কোন পরওয়া নাই।" [আহমদ ও ইবনু-আসাকির ইহা আবু দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন]।

আত্মিক পর্যায়ে আদমের আবির্ভাব নিয়ে বিজ্ঞান ও ধর্মের ক্ষেত্রে তেমন কোন দ্বন্দ্ব নেই। মূলতঃ বিজ্ঞানীগণ আত্মিক পর্যায়ে আদমের সূচনা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। তাদের মাথা-ব্যথা হলো দুনিয়ায় আদমের আবির্ভাব নিয়ে। তাই আমাদেরকে দুনিয়ায় আদমের আদি উৎসের সন্ধান পেতে হলে ক্রোমোজম ও জেনেটিক রূপান্তর সম্পর্কে জানতে হবে।

www.pathagar.com

ক্রোমোজম, জিন ও জেনেটিক রূপান্তর

জীবকোষের মধ্যকার একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্রোমোজম। এ ক্রোমোজম D. N. A (ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিয়িক এসিড) নামক অতি সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে তৈরী। এই D. N. A এর একটি অংশের নাম জিন (অতিক্ষুদ্র কণা)। জীবকোষের এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে নিয়ে আসে।এক্ষেত্রে একই গোত্রের বা পরিবারের মধ্যে একে অন্যের ক্ষেত্রে শত বৈচিত্র থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিল লক্ষ্য করা যায়। তাই দেখা যায় হাঁসের ডিম থেকে হাঁসের বাচ্চাই ফোটে। আবার মুরগির ডিম থেকে মুরগির বাচ্চাই ফোটে। এটা হলো কাঠামোগত দিক থকে পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাথে পরবর্তি প্রজন্মের মিল বা সাদৃশ্য। আবার দেখা যায় হাঁসের বাচ্চা জন্মের পর পানিতে রাখলে সাঁতার কাটতে থাকে। এদের ক্ষেত্রে কোন অস্বস্তি বা মৃত্যুর ভয় থাকে না। কিন্তু মুরগির বাচ্চা পানিতে রাখলে সেটি সাঁতার কাটতে পারে না। এক্ষেত্রে সেটি ডুবে মরবে। এ ধরনের স্বভাব তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাথে পরবর্তী প্রজন্মের আচরণগত সাদৃশ্য।

পৃথিবীর আদি প্রাণী প্রোটোজোয়া। এটি এককোষী প্রাণী। এদের বংশগতির ধারা বজায় থাকে কোষ-বিভাজনের মাধ্যমে। কোষ-বিভাজনের (দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া) সময় জীবকোষের মধ্যকার ক্রোমোজমটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে নতুন দু'টি কোষে বিভক্ত হয়। তখনও উভয়টির মাঝে পূর্ববর্তী কোষের গুণাগুণ বজায় থাকে। এখানে ক্রোমোজমের জিনগুলো পূর্ববর্তী প্রজন্মের সংবাদ পরবর্তী প্রজন্মে নিয়ে আসে।

নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ায় যখন পরমাণুর প্রোটনকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হয় তখন চেইন বিক্রিয়ায় মূল পরমাণুটি ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গতে থাকে। এ বিক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণহীন থাকে। এটি একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় হয়ত এমনটি ঘটে না। জীবকোষের মধ্যকার ক্রোমোজমটি যখন স্বাভাবিকভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়, তখন পূর্ববর্তী প্রজন্মের সকল সংবাদ (তথ্য) পরবর্তী প্রজন্মে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু কোন কারণে যদি এর ব্যাঘাত ঘটে তখন কিন্তু পূর্ববর্তী প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে না। এতে জীবের শারীরিক গঠন ও জীবনযাত্রা পাল্টে যায়। আমাদের দেহ কোষে যখন কোন ভাইরাস প্রবেশ করে তখন

www.pathagar.com

ঐ ভাইরাস দেহ কোষের স্বাভাবিক কাজ কর্ম দখল করে নেয়। ফলে কোষ বিভাজনের সময় ঐ ভাইরাসের গুণাগুণ নতুন কোষগুলোতেও স্থানান্তরিত হয়। এতে দেখা যায় অন্য কোন মাধ্যমের হস্তক্ষেপ ছাড়া নতুন কোন প্রজাতির উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলা যায় সব জীবের মূল উৎস এক ও অভিন্ন। মহাবিশ্বের মহান পরিকল্পনাকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমনি এক ও অভিন্ন পানির আদি জীব থেকে সাংগঠনিক বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন কাঠামো ও স্বভাবের প্রাণীর উদ্ভব ঘটিয়েছেন। কারণ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটানো একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত।

আল কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- "তিনি (আল্লাহ) তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টিতে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত করে থাকেন।" (সূরা ফাতির : ১)

"ওরা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করেন।" (সূরা আনকাবূত : ১৯)

উচ্চতর জীবের সন্তান সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় শুক্র ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। এ ভ্রূণ বিকশিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ সন্তান জন্ম নেয়। যা তাদের পূর্বসূরির অনুরূপ হয়। এ ক্ষেত্রে জিনগুলো পূর্বসূরির গুণাগুণের সংকেত বহন করে। এটি একটি স্বাভাবিক ও সফল প্রক্রিয়া। কিন্তু এরপরও জেনেটিক কোডে তথ্যের রূপান্তর ঘটতে পারে। যা ঘটে বাইরের কোন শক্তির প্ররোচণায়। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে পরিবর্তন দেখা দিবে। এই প্রক্রিয়াটিই জেনেটিক রূপান্তর (Mutation)। ধারণা করা যায় উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের বৈচিত্রময়তার ক্ষেত্রে অতীতে এমন অনেক জেনেটিক রূপান্তর ঘটেছে। যার ফলে অগণিত উদ্ভিদ ও জীব প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সেই জেনেটিক রূপান্তর এখন আর ঘটে না। তবে দেখা যায় পৃথিবীর আদি এককোষী প্রানীর কোন না কোন গুণাগুণ মানুষের মতো উচ্চতর প্রাণীর মধ্যেও লুকিয়ে আছে। এটা অন্যান্য জীবজন্তুর ক্ষেত্রেও খুঁজে পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে একটা প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির উদ্ভব হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। জীবের বেলায় যেমন জেনেটিক রূপান্তর ঘটতে পারে তেমনি জেনেটিক বিলুপ্তিও ঘটে। এতে এমন হয় যে পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে নতুন কোন প্রজন্ম জন্মই হয় না। ফলে একটা প্রজাতির ধীরে ধীরে বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু এমন যদি হয়

www.pathagar.com

যে, কোন একটি মায়ের গর্ভ থেকে জেনেটিক রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটলো। আবার সাথে সাথে ঐ প্রজাতির অন্যদের ক্ষেত্রে জেনেটিক বিলুপ্তির মাধ্যমে তাদের সমস্ত প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটল। এক্ষেত্রে একটি মায়ের গর্ভ থেকে যাদের উদ্ভব ঘটল তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে এদের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়ায় তাদের জন্মটা আশ্চর্যজনকই মনে হবে।

মূলতঃ Mutation প্রক্রিয়া একজীব থেকে অন্যজীব সৃষ্টির মূল ভিত্তি। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সাংগঠনিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় জীব প্রজাতির নানা ধরনের রূপান্তর ঘটেছে। তার পাশাপাশি অনেক প্রজন্মের বিলুপ্তিও ঘটেছে। তাই তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আর জেনেটিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটা লেজওয়ালা প্রাণীর জিন থেকে লেজের তথ্যটি যে ডি. এন. এ. কোড টেপ করে নিয়ে আসে সেটি যদি উধাত্ত করে দেয়া যায় তবে তাদের মাতৃগর্ভ থেকে লেজহীন নতুন এক প্রজাতির উদ্ভব ঘটবে। কিন্তু অন্যান্য আঙ্গিক গঠন হয়ত পুরানো বংশধরের মতোই থাকবে। এভাবে জেনেটিক রূপান্তরের মাধ্যমে একটা বানরের জিনের "লেজ তথ্য" যে D. N. A টেপ করে নিয়ে আসে সেখান থেকে যদি এই তথ্যটি উধাও করে দিয়ে টেস্ট টিউব বেবী যে পদ্ধতিতে জন্ম দেয়া হয় সে ব্যবস্থা নেয়া যায় তবে লেজওয়ালা বানরের বংশধর থেকেও লেজহীন বানরের উদ্ভব ঘটানো সম্ভব। তবে সে তথ্যটি মানুষের পক্ষে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু আল্লাহর পক্ষে এমন কিছু করা একান্ত সহজ ব্যাপার। আমরা ধারণা করতে পারি আদম ও বিবি হাওয়া পূর্ববতি প্রজন্মের বেলায় হয়ত তাই ঘটে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে আমরা জেনেটিক বিলুপ্তি ও আল কোরআনের উদ্ধৃতি যাচাই করলে তার সত্যতা খুঁজে পাব। ধারণা করা যায়- বর্তমান মানব প্রজন্মের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে একই সাথে জেনেটিক রূপান্তর ও জেনেটিক বিলুপ্তি ঘটেছে। তাই নতুন মানব প্রজাতির জন্ম দিয়ে তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের বিলুপ্তি ঘটেছে। ফলে তাদের পিতা-মাতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ জন্য তাদের পৃথিবীতে আবির্ভাব নিয়ে রূপকথার কাহিনী ও কুসংস্কারপূর্ণ তথ্যের সূত্রপাত ঘটেছে। সকল কুসংস্কারের মূল উৎপাটন করে সত্যের সন্ধান দেওয়াই আমার লক্ষ্য।

www.pathagar.com

জেনেটিক বিলুপ্তি

জেনেটিকস-এর মাধ্যমে পূর্বসূরিদের গুণাগুণ উত্তরসূরিদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। এর মাধ্যমে জীব প্রজাতির সন্তান-সন্ততি কাঠামোগতভাবে কোন রূপ পরিবর্তন ছাড়াই পুরোপুরি সেই প্রজাতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। সে জন্য গরু, গরুর বাচ্চাই প্রসব করে। আবার হাঁসের ডিম ফুটে মুরগির বাচ্চা হয় না। এরপরও আল্লাহর ইচ্ছায় সৃষ্টির ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতে প্রাকৃতিক পরিবেশের চাপে কিংবা সাংগঠনিক বিবর্তন ধারায় কোন না কোন সময় বিবর্তনধর্মী পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এতে জেনেটিক রূপান্তর (Mutation) এবং জেনেটিক বিলুপ্তি (Genetic Drift) উভয়টিই দেখা দিয়ে থাকে। Mutation এর মাধ্যমে একটি জীবের সন্তান-সন্ততি রূপান্তরিত হয়ে অন্য জীব সৃষ্টি হতে পারে। অপরদিকে Genetic Drift এর মাধ্যমে একটি জীব চির দিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ ঘটনাগুলো ঘটে জননকোষের (gamete) জিন এর ক্ষেত্রে। Mutation এর বেলায় আকস্মিকভাবে জিনে রূপান্তর ঘটে থাকে। অপরদিকে Genetic Drift এর বেলায় আকস্মিকভাবে একটি জিন বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এর ফলে তাদের বংশবৃদ্ধি না হয়ে সেই প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মানুষের মাঝে অনেক পরিবার আছে যাদের সন্তান-সন্ততি অনেক থাকে। এর মধ্যে কারও শুধু ছেলে থাকে আবার কারও শুধু মেয়ে হয়। অপরদিকে অনেকেই আছে যাদের কোন সন্তানই থাকে না। যাদের সন্তান থাকে না তাদের মৃত্যুর পর ঐ বংশের আর কোন উত্তরসূরি থাকে না। এ ক্ষেত্রে এই পরিবারের বংশগতির ধারার বিলুপ্তি ঘটে। এভাবে যদি সারা পৃথিবীর মানুষের Genetic Drift দেখা দিত তবে একদিন না একদিন বর্তমান প্রজাতির মানুষেরও বিলুপ্তি ঘটত। Genetic Drift এর বেলায় আকস্মিক জিন উধাও হয়ে যাওয়াতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিষিক্ত হতে ব্যর্থ হয়। ফলে একটি জীব প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে। অতীতে এভাবে অনেক জীব

www.pathagar.com

প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। তার মধ্যে মানব প্রজাতির উন্নতর ধাপ বর্তমান প্রজাতির মানুষের আগেও নিম্ন ধাপের জীব মানুষের অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে।

আল-কোরআনে উল্লেখ রয়েছে-

"তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে পারেন এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। যেমন তোমাদের তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন আম : ১৩৩)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে আদমের প্রজাতির আগেও এক শ্রেণীর জীব প্রজাতির অনুন্নত মানব প্রজাতি পৃথিবীতে বসবাস করত, যাদের প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে আদম প্রজাতিকে। এ ক্ষেত্রে জেনেটিক রূপান্তর ও জেনেটিক প্রবাহ দু'টি ব্যবস্থাই পাশাপাশি কার্যকরী ছিল। একদিকে জেনেটিক রূপান্তরের মাধ্যমে অন্য মানুষের বংশধর থেকে আদম ও হাওয়ার জন্ম হয়েছে। অপরদিকে জেনেটিক বিলুপ্তির (Genetic Drift) মাধ্যমে নিম্ন ধাপের সকল মানুষের বিলুপ্তি ঘটেছে। সেই নিম্ন শ্রেণীর মানুষের ফসিল এখনও মাটি খুঁড়ে পাওয়া যাচ্ছে। বিলুপ্তির এই ধ্বংসলীলা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটেনি। বরং তা ঘটেছে আল্লাহ তা'আলার পরম ইচ্ছায় জিন উধাও হয়ে।

আল্লাহ বলেন- "আমি ওদের সৃষ্টি করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব ওদের পরিবর্তে ওদের অনুরূপ অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব।" (সূরা দাহর : ৪২)

"তিনি (আল্লাহ) তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টিতে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত করে থাকেন।" (সূরা ফাতির : ১)

এ প্রসঙ্গে উদাহরণটি হবে এমন– যেমন একটি ভিডিও ক্যাসেটে ধারাবাহিকভাবে অনেক লোকের জীবন পদ্ধতির তথ্য টেপ করা আছে। এর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বংশগতির চিত্রও রয়েছে। এবার ক্যাসেটের মালিক সেখান থেকে শেষের দু'জনের কর্মজীবনের ফটো ও বংশগতির ধারার চিত্র ধারাবাহিকভাবে রেখে তার পূর্বের সকল মানুষের কর্মজীবনের

www.pathagar.com

ফটো ক্যাসেট থেকে বিলুপ্তি ঘটালেন। এতে দেখা যাবে যে, শেষের দু'জন হবেন পৃথিবীর আদি মানব-মানবী। ফলে তাদের পিতা-মাতার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের বিলুপ্তি ঘটায় বিবর্তনের ক্ষেত্রে মাঝ পথে একটা শূন্যতা দেখা দেয়, ফলে বর্তমান মানব প্রজাতি যে বিবর্তনের মাধ্যমে উন্নতর ধাপে পৌঁছেছে তা বুঝা যায় না। অর্থাৎ বর্তমান বুদ্ধিসম্পন্ন মানব প্রজাতির কাছাকাছি অন্য কোন জীব মানুষের প্রজাতির অস্তিত্ব না থাকায় বিবর্তন যে হয়েছে এটা বুঝানোই কঠিন।

মূলত জেনেটিক বিলুপ্তির ক্ষেত্রে Gamete গুলো নিষিক্ত (Fertilization) হতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ পিতা-মাতার Gamete গুলো মিলিত হয়ে জাইগোট বা ভ্রুণ সৃষ্টি করতে পারে না। যে তথ্যকণার মাধ্যমে ভ্রুণ সৃষ্টির কাজটি সম্পন্ন হয় সেই D. N. A তথ্যটি আকস্মিক ভাবে জিন থেকে উধাও হয়ে যায়। এ ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন একমাত্র আল্লাহর ইশারায় ঘটতে পারে। আল্লাহর ইশারায় যে মানুষ জাতির নিম্ন ধাপগুলোর বিলুপ্তি ঘটেছে তা আল-কোরআনেই উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান যুগে জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং কোরআনের সেসব শাশ্বত বাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে আমাদেরকে তার অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং ও মানবক্লোনিং

জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং এ যুগের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। এর মাধ্যমে একটি জীবের একটি জিনকে আলাদা করে নিয়ে অন্য একটি জীব কোষে প্রবিষ্ট করানো হয়। এর ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণী রূপান্তরিত হয়ে নতুন কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে। একে বলা চলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত রূপান্তর। এটি মানুষের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ঘটে থাকে। এ পদ্ধতি ছাড়াও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের রূপান্তর ঘটানো যায়। সেটি হলো আড়-পরাগয়ণ। কিন্তু ইদানীং জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং এতোই উন্নতি লাভ করেছে যে, এ প্রক্রিয়ায় এখন মানব ভ্রূণ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তা আরও এক ধাপ এগিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় রয়েছে। একে বলা হয় মানব ক্লোনিং। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লোন এইড কোম্পানী 'এভ' নামের সন্তান জন্মের কথা স্বীকার করেছে।

মানব ক্লোনিং-এর ক্ষেত্রে ভ্রূণ তৈরীর জন্য পিতার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ শুক্রকীট ছাড়াই মানব ভ্রূণ তৈরী করা সম্ভব। মাতার একটি ডিম্বানু কোষই বিভাজিত হয়ে একটি ভ্রূণে পরিণত হতে সক্ষম। এ পদ্ধতির নাম প্যাথেনোজেনোসিস প্রজনন প্রক্রিয়া। এরকম প্রজনন প্রক্রিয়া সাধারণত কীট-পতঙ্গের মধ্যে সংঘটিত হয়। কিন্তু অন্যান্য জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে এ রকম প্রজনন রীতি লক্ষ্য করা যায় না। স্বাভাবিক প্রজনন রীতিতে একটি শুক্রকীট একটি ডিম্বানুতে প্রবেশ করে নিষিক্ত (Fertilization) হলে একটি ভ্রূণ তৈরী হয়। কিন্তু ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানীগণ ভ্রূণ তৈরী করতে শুক্রকীট ব্যবহার করেনি। অর্থাৎ ক্লোনিং-এর ক্ষেত্রে ভ্রূণ তৈরীর জন্য পিতার প্রয়োজন হয় না।

এ পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীগণ একটি মানবীর (মাতার) ডিম্বানু সংগ্রহ করেন। তারপর ডিম্বানুর নিউক্লিয়াসটি বের করে নিয়ে আসেন। এ ধরনের নিউক্লিয়াসহীন ডিম্বানুর পাশাপাশি রাখা হয় মানুষের চামড়া থেকে সংগ্রহ

www.pathagar.com

করা একটি কোষ। এরপর ডিম্বানু ও কোষের উপর প্রয়োগ করা হয় জোরালো বিদ্যুৎ প্রবাহ। এর ফলে নিউক্লিয়াসটি ডিম্বানুর ভেতরে প্রবেশ করে। এতে সেটি (ডিম্বানুটি) কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। তারপর এই ডিম্বানুটি একটি সুরক্ষিত পাত্রে রাখা হয়। সেখানে তিন থেকে চার দিনের মধ্যে একটি স্থিতিশীল ভ্রুণ তৈরী হয়। এটি একটি ষ্টেম সেল (কোষের ক্ষুদ্র অংশ)। অতঃপর এ ষ্টেম সেল এর মাধ্যমে যার শরীরে চামড়া ব্যবহার করা হয়েছিল তার প্রয়োজনে শরীরে যে কোন অংশের কোষ তৈরী করা সম্ভব হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিটি রোগীদের জন্য আশানুরূপ সুখের হলেও বর্তমানে এ ক্লোনিং পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীগণ পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরীর চেষ্টা করছেন। এ পদ্ধতিতে ষ্টেম সেলটি টেস্ট টিউব বেবী জন্ম দেয়ার পদ্ধতির ন্যায় তা প্রতিস্থাপন করা হয় কোন না কোন সক্ষম মাতার মাতৃথলিতে। অতঃপর সেখানেই দিনে দিনে পূর্ণাঙ্গ মানুষটি সৃষ্টি হয়ে থাকে। জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং-এর সফলতায় পিতা ছাড়াও যে সন্তান হতে পারে সে সত্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেছেন।

অতীতে এমন এক সময় ছিল (বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার পূর্বে) যখন মানুষ পিতা ছাড়া সন্তান হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেনি। তাই তাদের কাছে বিষয়টি ছিল রহস্যময় ও আশ্চর্যজনক। ফলে বিবি মরিয়মের গর্ভে যখন পিতার সংস্পর্শ ছাড়াই সন্তান হয়েছিল তখন সে সময়ের মানুষ তা বিশ্বাস করতে পারেনি। বরং বিবি মরিয়মও বিস্মিত হয়েছিলেন। কারণ বিবি মরিয়মের গর্ভে সন্তান এসেছিল পিতার সংস্পর্শ ছাড়াই।

আজ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সফলতায় মানব ক্লোনিং-এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টির সূচনা করতে সক্ষম। এদিক থেকে স্রষ্টা পুনঃসৃষ্টি, জীব প্রজাতির রূপান্তর, সৃষ্টির সূচনা, বস্তু ও বস্তুর উপাদানের উদ্ভবসহ প্রাণের উৎপত্তি ঘটাতে সক্ষম। বরং বলা যায় আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব বলতে কিছু নেই। তিনি (আল্লাহ) আদম ও বিবি হাওয়াকে ঈসা (আ)-এর ন্যায় অনুরূপ পদ্ধতিতেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষে নতুন কোন প্রজাতির উদ্ভব ঘটানো এবং পিতার সংস্পর্শ ছাড়াই মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান

www.pathagar.com

পয়দা করা মানুষের মতো ব্যাপক কারিগরি যন্ত্রপাতি নিয়ে কর্মব্যস্ত থাকার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ এরাদা করার পর 'হও' বললেই সবকিছু হয়ে যায়। এখানে এরাদা + 'হও' = সৃষ্টির উদ্ভব। অর্থাৎ তথ্য (এরাদা) + তরঙ্গ (হও) = তথ্য তরঙ্গ বা তথ্য কণা কিংবা তথ্য কাঠামো। মূলতঃ জগতের সকল কিছুই তথ্যের জমাটবদ্ধ রূপ। একজন মানুষের একটি কোষ একটি তথ্যের লাইব্রেরী। সে হিসেবে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহ অসংখ্য লাইব্রেরীর সমান। স্রষ্টার 'এরাদা' ও 'হও' বলা থেকেই তথ্যের উৎপত্তি।

আল্লাহ বলেন, "সে বলেছিল (মরিয়ম), হে আমার প্রতিপালক, কিভাবে আমার পুত্র হবে? কোন মানুষ (পুরুষ) তো আমাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি বললেন, এভাবেই; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যখন তিনি কোন কার্যের মনস্থ করেন তখন তিনি "হও" ব্যতীত বলেন না; ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৭)

"ওরা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করেন।" (সূরা আনকাবুত : ১৯)

আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নতর জীব, আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার বংশধর। মানবজাতি সৃষ্টির এ পর্যায়ে আসতে অনেক ধাপ পার হতে হয়েছে। কারণ সকল জীবের আদি উৎস হলো পানি। এ ক্ষেত্রে মানুষকে পানি ও কাদামাটির বিশুদ্ধ সারভাগ থেকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সমস্ত প্রকারের প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে।" (সূরা আন নূর : আয়াত ৪৫)

"আমরা গঠন করেছি মানুষকে কাদামাটির বিশুদ্ধ সারভাগ থেকে।" (সূরা মুমেনুন : আয়াত ১২)

উপরোল্লিখিত দু'টি আয়াতে মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে বিশুদ্ধ পানি ও মাটির কথা এসেছে। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর সমস্ত জীব পানির এক কোষী জীবন থেকে উদ্ভব হয়েছে। যা দীর্ঘ দিনের জেনেটিক রূপান্তরের মাধ্যমেই সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা সফল জেনেটিক মহাবিজ্ঞানী।

www.pathagar.com

স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক জেনেটিকস বিবর্তন পদ্ধতির চূড়ান্ত ধাপ পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমাদের মাধ্যমে সফলতা পেলেও এখানেই তা থেমে থাকবে না। জীবনের সফলতা ও বিফলতা নির্ধারণ হলে, নতুন রূপে ও নতুন গঠনে, পূর্ণতার মাধ্যমে বিবর্তন থেমে যাবে। প্রকৃতির রাজ্য দিনে দিনে চরম বিশৃংখলার দিকে চলে যাচ্ছে। এটাই বড় প্রমাণ যে প্রকৃতির রাজ্যের জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং-এর কাজ থেমে যায়নি। সামনে আরও রূপান্তর হবে। সে রূপান্তরের প্রবর্তক হলেন স্রষ্টা নিজেই। বর্তমানের জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং ও মানব ক্লোনিং-এর সফলতা প্রকৃতির রাজ্যের জীব প্রজাতির রূপান্তরের বড় ধরনের দৃষ্টান্ত।

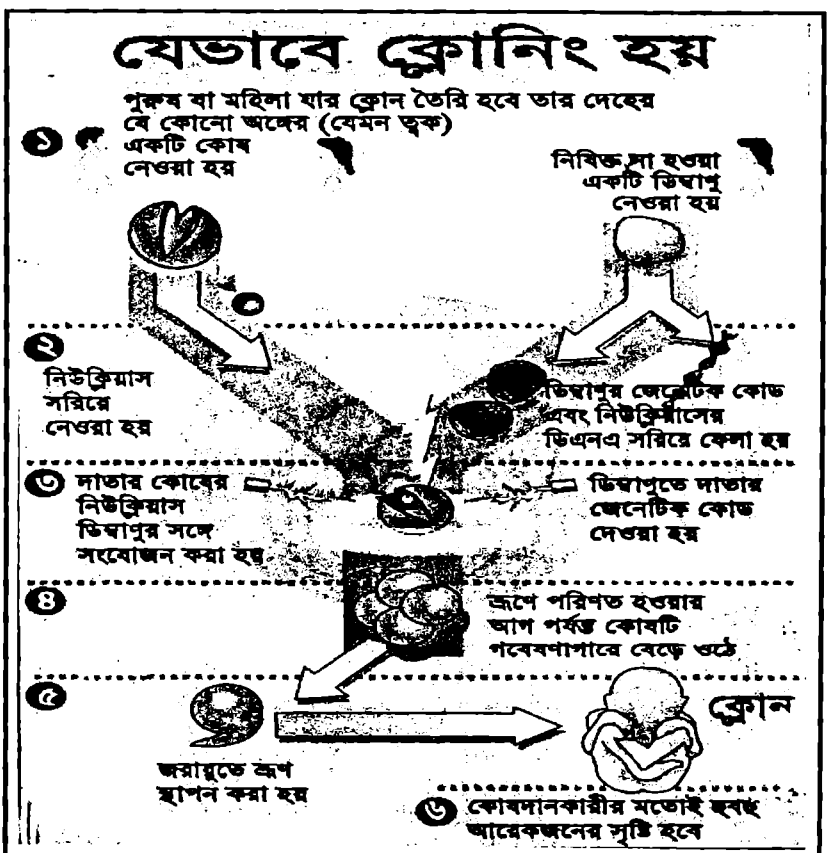

www.pathagar.com

বিবর্তনবাদ ও মানুষ

বিবর্তনবাদ (Theory of Evaluation) প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এক প্রজাতির জীব থেকে অন্য প্রজাতির জীবের কিভাবে উদ্ভব ঘটে তার ব্যাখ্যা প্রদান করে। চার্লস ডারউইন ছিলেন বিবর্তনবাদের সফল উপস্থাপক। তার সময়ে মেণ্ডেলাও এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। ডারউইনের মতে সব প্রজাতির বা প্রকৃতির সাথে জীবন সংগ্রমে টিকে থাকতে পারে না। যাদের যোগ্যতা বেশী তারাই শুধু টিকে থাকে। যোগ্যতার লড়াইয়ে জয়ী হয়ে পরবর্তী প্রজন্মের ধারাবাহিকতা টিকে থাকাই হলো প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natunal Selection)। অপর দিকে জেনেটিক রূপান্তরের মাধ্যমে সব জীব একটি মাত্র জীব থেকে উদ্ভব হয়েছে। এর মূলে কাজ করে প্রাণীর ক্রোমোজোমের সূক্ষ্ম কণা DNA-এ জিনগুলো। জিন-এর মাধ্যমে পূর্ব পুরুষের উত্তরাধিকারধারা নতুন বংশগতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়।

আবার এই জিনের রূপান্তরের ফলে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। তিনি চিন্তা করে ছিলেন জীবের আঙ্গিক পরিবর্তন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকার অভিব্যক্তির প্রকাশ মাত্র। ডারউইন এখানেই ভুল করেছেন। কারণ আঙ্গিক পরিবর্তন জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার উপরই শুধু নির্ভরশীল নয়। এর মূলে আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিব্যক্তিই প্রধান। আল্লাহ বলেন–

"আল্লাহই প্রত্যেক জিনিসকে আকার ও প্রকৃতি দান করেছেন।" (সূরা ত্বহা ২০ : আয়াত ৫০)

"আমরা (আল্লাহ) মানুষকে গঠন করেছি সর্বোত্তম সাংগঠনিক পরিকল্পনা অনুসারে।" (সূরা তীন : আয়াত ৪)

"(আল্লাহ) সেই একক সত্তা যিনি মানুষকে পানি থেকে গঠন করেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন বংশধারা (পুরুষের মাধ্যমে) এবং আত্মীয়তার ধারা নারীদের মাধ্যমে।" (সূরা আল ফুরকান : আয়াত ৫৪)

"আমরা তোমাদেরকে গঠন করেছি মাটি থেকে।" (সূরা হজ্ব : আয়াত ৫)

www.pathagar.com

মানুষকে পানি থেকে, আবার মাটির সারভাগ থেকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এ বর্ণনার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় যে, জীব জগতে ও উদ্ভিদ জগতে অতীতে একটা সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক বিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু আঙ্গিক পরিবর্তন পরিবেশের সাথে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার চেষ্টা থেকে আকস্মিকভাবে ঘটেনি। এটি ঘটেছে স্রষ্টার ইঙ্গিতে জিন রূপান্তরের মাধ্যমে।

জীব ও উদ্ভিদের দেহের মৌলিক উপাদান হলো জীবকোষ। পৃথিবীর আদি এককোষী প্রাণীর কোষ উপাদানের গঠন ও বহুকোষী প্রাণীর কোষের মধ্যে রয়েছে প্রচুর মিল। এটিই প্রমাণ করে যে এক কোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে।

"পৃথিবীর আদি প্রাণী ফাইলা শ্রেণীভুক্ত। এদেরকে প্রোটোজেন্স বলা যায়। এই এক কোষী জীবেরা একটা পর্যায়ে এসে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বহুকোষী জীব সৃষ্টি করে। এই ধারার এটাই হচ্ছে জীব জগতের বিবর্তনের প্রথম দৃষ্টান্ত।" (তথ্য ঃ মানুষের আদি উৎস)

জীবজগতের বিভিন্ন প্রজাতি একটি মূল প্রজাতি থেকে উদ্ভব হয়েছে। তবে দৈহিক গঠন-কাঠামোর আওতায় থেকেও এইসব প্রজাতি সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।" (তথ্যঃ মানুষের আদি উৎস)

জীব প্রজাতির পরিবেশগত কারণে তাদের দৈহিক ও চাহিদা বদলে যেতে পারে। আবার ভিন্ন অভ্যাসের জন্য কোন কোন অঙ্গ অধিক ব্যবহারে তার দৃঢ়তা বাড়তে পারে। আবার কোন অঙ্গ দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত থাকতে থাকতে সঙ্কুচিত হয়ে যেতে পারে। কিংবা সেটির বিলুপ্তিও ঘটতে পারে। এটাই বিবর্তনবাদের মূল কথা।

আরবের মরু জাহাজ হিসেবে খ্যাত উটের গঠন আকৃতিতে পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মরুভূমিতে পানির খুব অভাব। সেখানে ধূলিঝড় হয়। উটের দেহে পানি মওজুদ রাখার জন্য রয়েছে আলাদা থলে।

www.pathagar.com

প্রয়োজন অনুযায়ী সে থলে থেকে তারা পানি ব্যবহার করে। আবার তাদের দেহে রয়েছে অক্সিজেন মওজুদ রাখারও ব্যবস্থা।

যখন মরুভূমিতে ধূলিঝড় হয় তখন এমনও হয় যে, ধূলিস্তূপের মধ্যে উটগুলো ডুবে যায়। এমতাবস্থায় মওজুদকৃত অক্সিজেন দিয়ে উটের জীবন রক্ষা হয়। এখানে অক্সিজেন গঠনের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পরিবেশের অনুকুল প্রজাতির উদ্ভব হওয়া প্রাণীর নিজস্ব অনুভূতি ও চেষ্টার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে মহা পরিকল্পনাকারীর সাংগঠনিক বিবর্তন নীতিই কাজ করেছে। সেই পরিকল্পনাকারীর ইঙ্গিতে সারা পৃথিবীর মানুষের রং, আকার (লম্বা, খাটো) ভাষার ভিন্নতা থাকলেও দৈহিক গঠন কাঠামো একই। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মানুষ এক আদমেরই সন্তান। তবে মানুষ প্রজাতির সাংগঠনিক উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের চূড়ান্ত ধাপ হলো আদমের প্রজাতি– এটা কোরআন, বিজ্ঞান ও দর্শনের অন্তর্নিহিত তথ্য। সে সত্য উৎঘাটনে আমাদেরকে নিরপেক্ষ মন নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক নির্বাচন ও উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন

পৃথিবীর আদি এককোষী জীব 'প্রোটোজোয়া' কি করে বহুকোষী জীবে রূপান্তরিত হলো তার ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু মানব মনের স্বভাবজাত ধর্ম হলো-অজানা কোন রহস্য তালাশ করা। এমন স্বভাব প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে না থাকলে তারা কখনো কঠিন কঠিন জিনিস আবিষ্কার করতে পারত না। তাই প্রশ্ন যত কঠিনই হোক না কেন তবু মানব মন বসে, থাকে না। যে কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল কিংবা সত্য যাই হোক, সত্য অনুসন্ধিৎসু মানুষ তা বের করেই থাকে। প্রসঙ্গত একবার যদি ভুলও হয় তবে অন্য সময় হলেও সত্যের সন্ধান মেলে। সে জন্য মানুষের চেষ্টা থেমে থাকে না।

বিজ্ঞানীগণ জীবের উদ্ভব ও রূপান্তরকে বিবর্তনের খেলা মনে করেন। এ ক্ষেত্রে চার্লস ডারউইন জীবের রূপান্তরের জন্য প্রাকৃতিক নির্বাচন নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তার মতে পৃথিবীর সকল জীব প্রাকৃতিকভাবে টিকে থাকা এবং তাদের বংশ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়ার সমান যোগ্যতা রাখে না। যাদের যোগ্যতা বেশী তারাই প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকে। অপরদিকে জীবের শারীরিক কাঠামোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রূপান্তরও ঘটেছে ঐ একই প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে করতে জীবগুলো স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ নির্বাচনী অনুকুল-অংগ, রং ইত্যাদি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় পৃথিবীর এককোষী জীব থেকে যেহেতু সমস্ত জীবের উদ্ভব হয়েছে তাই সৃষ্টির আদিতে প্রতিটি জীবই (পরিবেশের অনুকুল জীব) ভিন্ন ভিন্ন অনেক জীবের বাচ্চা প্রসব করে। এ ক্ষেত্রে জীবের জেনেটিক রূপান্তর অথবা একটি জিন আকস্মিক উধাও হয়েও তা ঘটতে পারে। এ ব্যবস্থাটি দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে ঘটেছে। কিন্তু এখন আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে শারীরিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটছে না। তাই এখানে এসে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তাহলে কি জীবের জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রচেষ্টা একেবারেই থেমে গেছে? মূলত কোন জীবেরই জীবন

www.pathagar.com

সংগ্রামে টিকে থাকার প্রচেষ্টা থেমে যায়নি। এর ফলেও যেহেতু কোন প্রজাতির নতুন করে আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটছে না, তাই জীবের ক্রমবিকাশ রূপান্তর ও আঙ্গিক পরিবর্তন সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করা শুরু হয়েছে। সে প্রচেষ্টারই নতুন সংযোজন উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন।

এ শ্রেণীর বিবর্তনের বেলায় জীবের জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রচেষ্টা থেকে তার আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটেনি। বরং এক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় একজন মহা পরিকল্পনাকারীর সৃষ্টির সম্প্রসারণের ব্যগ্রতা এখানে কাজ করেছে। এ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াতেও বিবর্তন ছিল, তবে সে বিবর্তন ডারউইনী বিবর্তন নয়। এ ক্ষেত্রে জীবের আঙ্গিক পরিবর্তন স্রষ্টার উদ্দেশমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন নীতির মাধ্যমে ঘটেছে।

"আল্লাহই প্রত্যেক জিনিসকে এর আকার ও প্রকৃতি দান করেছেন।" (সূরা ত্বহা ২০ : আয়াত ৫০)

পৃথিবীর সকল জীব থেকে নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হওয়ার যে সব নিয়ম নীতি রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো এককোষী জীবের কোষ বিভাজন পদ্ধতি (প্রোটাজোয়ার বংশ বৃদ্ধির প্রদ্ধতি)। দ্বিতীয় নিয়মটি হলো, প্রজনন পদ্ধতি (এটি যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে ঘটে)। তৃতীয়টি হলো যৌন সঙ্গম বহির্ভূত মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম হওয়ার পদ্ধতি। এক্ষেত্রে পুরুষ সঙ্গীর সাথে স্ত্রী সঙ্গীর মিলনের প্রয়োজন হয় না।

আজকাল বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে দেখা যাচ্ছে জেনেটিক ইন্‌জিয়ারিং-এর মাধ্যমে জীব ও উদ্ভিদের জেনেটিক সংকেতের উদ্দেশ্য প্রণোদিত রূপান্তর ঘটানো হচ্ছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে একটি জীব থেকে একটি জিনকে বিচ্ছিন্ন করে তা অন্য একটি জীবের কোষে প্রবিষ্ট করিয়ে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। এটি এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে পুনরায় নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটানো সম্ভব। এটি যৌন সঙ্গম বহির্ভূত পদ্ধতি। কিন্তু এর মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা করা সম্ভব নয়। অপর দিকে পরোক্ষভাবে আড়-পরাগায়ণ পদ্ধতিতেও উদ্ভিদের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে পরিবেশের কোন মিউটেজেনিক এজেন্ট (Mutagenic agent) DNA কে প্ররোচিত বা আয়োজিত করে পুনঃগঠনে বাধা অথবা বিলুপ্তির মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে মিউটেজেনিক এজেন্ট হিসেবে ধরা হয় বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক রাসায়নিক দ্রব্যাদিকে। এগুলো হলো– আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ; অতি বেগুনী রশ্মি অথবা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি। কিন্তু DNA কে প্ররোচিত করার ব্যাপারে যে সব দ্রব্যাদির কথা বলা হয়েছে, তা কিন্তু প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বর্তমানে এগুলোর উপস্থিতির ফলেও যেহেতু জীবের আঙ্গিক রূপান্তর ঘটে না, সে কারণেই প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে জীব জগতের রূপান্তর ঘটেছে, এ কথা এখন আর কেউ বিশ্বাস করে না। অপরদিকে উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন পদ্ধতির মাধ্যমে জীবের আঙ্গিক রূপান্তর, সৃষ্টির আদি সূচনা, বংশের পুনরাবৃত্তি, বিলুপ্তি, আকার-আকৃতি, নতুন প্রজাতি উদ্ভব, সবগুলোই সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

আল্লাহ বলেন,

"যা-তা খোলার জন্য নয়-একটা মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (সূরা দুখান ৪৪ : আয়াত ৩৮, ৩৯)

আল্লাহ কোন কিছুর সূচনা করতে যেয়ে বলে থাকেন 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়। এর মাধ্যমে সৃষ্টির আদি সূচনা ও নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে থাকে। আল-কোরআনে এরশাদ হচ্ছে-

"আল্লাহ যা খুশি তাই সৃষ্টি করতে পারেন; যখন তিনি কোন কিছু ঘটাতে চান; তখন তাকে বলেন, 'হও' আর এমনি তা হয়ে যায়।" (সূরা আলে ইমরান ৩ : আয়াত ৪৬)

"আমি যে জিনিসের এরাদা করি সেজন্য শুধু এতটুকু বলতে হয় 'হয়ে যাও' তাহলেই তা হয়ে যায়।" (সূরা নাহল : আয়াত ৪০)

জীব জগতের আদি পুরুষ বা প্রথম প্রজাতির প্রথম জীবটির সূচনা হয়েছে পানি থেকে। এখানে পানি এবং পানির সাথে মিশ্রিত অন্যান্য জৈব

www.pathagar.com

রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে আদি জীব প্রোটোজোয়ার সৃষ্টি হয়। এখন যদি পানি এবং পানির সাথে মিশ্রিত (অথাৎ প্রোটোজোয়াতে যা থাকে) ঐ পদার্থ গুলোকে এক সাথে রেখে দেয়া যায় তবু এগুলো থেকে একটি প্রোটোজোয়ার জন্ম হবে না। তাই একে আমরা প্রাকৃতিক নির্বাচন বলতে পারি না। সৃষ্টির সূচনা আল্লাহ যে পদ্ধতিতে করেছেন সেখানে মা বাবার যৌন মিলনের প্রথা চালু নেই। এখানে শুধু পানি ও পানিতে মিশ্রিত জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর পরিণাম ও অনুপাত এক করে আল্লাহ "কুন ফাইয়া কুন"-এর মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা করেছেন। এখানে "কুন ফাইয়া কুন" হলো স্রষ্টার কমাণ্ড আদেশ বা Information bit । এ তথ্যটি জীব কোষের ক্রোমোজমের জিন-এ মওজুদ থাকে। মূলত এককোষী জীব থেকে নিয়ে জীব প্রজাতির উন্নতর ধাপ মানুষের দেহ কোষে রয়েছে তথ্য কণার সমাহার। এ তথ্য কণা প্রাণীর অভিব্যক্তি থেকে সৃষ্টি হলে এখনও জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রয়োজনে নতুন তথ্য কণা সৃষ্টি হয়ে জীবের আঙ্গিক পরিবর্তন দেখা দিত। যেহেতু এমন আর হচ্ছে না, তাই বলা যায় যিনি সৃষ্টির সম্প্রসারণের জন্য তথ্য কণা বা Information bit পাঠিয়েছেন তিনিই আল্লাহ। তিনি জগতের স্রষ্টা। তাঁর ইচ্ছাতেই জগতের সমুদয় প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে। সেজন্য জীব প্রজাতির ক্রমবিকাশ স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন পদ্ধতি বলা চলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাই ঘোষণা করেছেন–

"ওরা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন; অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন?" (সূরা আনকাবুত : আয়াত ১৯)

"সব জীবকে আল্লাহ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এদের কোনটি হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কোনটি চলে দু'পায়ে, আর কোনটি চলে চার পায়ে।" (সূরা আন নূর ২৪ : আয়াত ৪৫)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়–জীব ও উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ শুরু হয় পানির সরলতম জীব- প্রোটোজোয়া থেকেই। পরবর্তী পর্যায়ে জীবের স্বতন্ত্র অঙ্গগুলো পরিবেশের অনুকূল করে স্রষ্টাই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক

www.pathagar.com

নির্বাচনবাদীগণ জীবের স্বতন্ত্র অংগগুলোকে জীবের জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার হাতিয়ার মনে করেন; যা এখন পর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি।

আল-কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"আল্লাহ সৃষ্টিধারা প্রবর্তন করেন, তারপর পুনরাবৃত্তি করেন।" (সূরা রূম ৩০ : আয়াত ২৭)

"সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক পরিমাণ ও অনুপাতে।" (সূরা ক্বামার ৫৪ : আয়াত ৪৯)

পৃথিবীর সমস্ত জীব যেমন একটি মাত্র এককোষী জীব থেকে উদ্ভব ঘটেছে তেমনি পৃথিবীর সকল মানুষ এক নর (পুরুষ) থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এখানেও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে স্রষ্টার পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন পদ্ধতির ছোঁয়া ছাড়া কিছুই হয়নি। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনে ঘোষণা করেছেন–

"তোমরা ভয় কর সেই প্রভূকে যিনি এক আত্মা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা হতে সৃষ্টি করেছেন তার সহধর্মীনীকে এবং সেই দু'জন (আদম ও হাওয়া) হতে তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসা : আয়াত ১)

এখানে এক আত্মা থেকে তার সহধর্মিনী সৃষ্টি করা অনেকটা কোষ বিভাজন, যা নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ার মতো বিভাজন পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে এক আত্মা থেকে তার সহধর্মিনী সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ আত্মার মাঝে তার সহধর্মিনী পাওয়ার ব্যগ্রতা ছিল। তারপর স্রষ্টার "কমাণ্ড-আদেশ"-এর উদ্দীপনায় ঐ আত্মা থেকে সৃষ্টি হয় তার সঙ্গিনী। এখানে এক আত্মা হলো Positive Imformation Bit এবং তার সঙ্গীনি হলো Negative Information Bit. এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গিনী সৃষ্টির জন্য যৌন মিলনের প্রয়োজন হয়নি। তারপর দু'জনের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখানে যৌন মিলন পদ্ধতি কার্যকরী ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু আমি এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাচ্ছি তা হলো যৌন মিলন পদ্ধতি ছাড়াও মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান হওয়ার মতো যে পদ্ধতিটি রয়েছে। সেখানে পিতার সংশ্রব ছাড়াই মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান হয়। এখানেও স্রষ্টার "কুন ফাইয়া কুন" নির্দেশ কাজ করে।

এক্ষেত্রে পানি ও মাটি সারভাগের মাধ্যমে প্রথম সৃষ্টির বেলায় যেভাবে আদি এককোষী জীব সৃষ্টি করা হয়, সে প্রক্রিয়াতে শুক্রকীট তৈরী করে স্রষ্টা "কুন ফাইয়া কুন" নির্দেশের মাধ্যমে তা প্রোথিত করেন কোন এক মাতৃথলিতে (জরায়ু বা সন্তান উৎপাদনের ডাইসে)। সেখানেই সন্তানের বিকাশ ঘটে। এ পদ্ধতিতে বিবি মরিয়মের গর্ভ থেকে ঈসার (আ) জন্ম হয়েছিল।

সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"সে বলেছিল (মরিয়ম), হে আমার প্রতিপালক কিরূপে আমার পুত্র হবে? কোন মানুষ (পুরুষ) তো আমাকে স্পর্শ করেনি। তিনি বললেন, এই রূপেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; যখন তিনি কোন কাজের মনস্থ করেন তখন তিনি "হও" ব্যতীত বলেন না; ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়।" (আলে ইমরান : আয়াত ৪৭)

উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে যেমন পিতা ছাড়া সন্তান হওয়া সম্ভব তেমনি এক প্রজাতির জীবকে বিলুপ্ত করে শুধু মাতৃ গর্ভ থেকে অন্য প্রজাতির উদ্ভব ঘটানো বিচিত্র কিছু নয়। এটা স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন ধারার সফল পদ্ধতি। আমার বিশ্বাস প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন নতুন অঙ্গ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব হয়নি বরং স্রষ্টার নির্দেশে উপরের পদ্ধতিতে পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে জনন কোষের DNA থেকে তথ্য কণার বিলুপ্তি বা সংযোজন ঘটিয়েই নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। স্রষ্টার 'কুন ফাইয়া কুন' হলো কমাণ্ড আদেশ বা Information bit । এর মাধ্যমে তথ্য তরঙ্গের বিলুপ্তি ও সংযোজন উভয়টি ঘটতে পারে। স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন ধারার সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া যতদিন চালু ছিল, ততদিন যে কোন জীব

www.pathagar.com

থেকেই ভিন্ন ভিন্ন অনেক জীবের বাচ্চা প্রসব হত। কিন্তু এখন আর সেই পদ্ধতি চালু নেই বলে নতুন কোন জীব প্রজাতির উদ্ভব ঘটছে না। আল্লাহ এ পদ্ধতিতে জগতে অনেক প্রজাতির যেমন বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন, তেমনি নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটিয়েছেন। আল্লাহ বলেন–

"তিনি (আল্লাহ) চাইলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং তিনি যাদেরকে চাইবেন উত্তরাধিকারী হিসাবে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, ঠিক যেভাবে অন্য মানুষের বংশধর হতে তোমাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন।" (সূরা ৬: আয়াত ১৩৩)

পৃথিবীতে কিভাবে এক প্রজাতির বিলুপ্তি এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে তা ক্রোমোজম, জিন, জেনেটিক রূপান্তর এবং জেনেটিক বিলুপ্তি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলতে চাচ্ছি যে পৃথিবীর সমস্ত জীবের দৈহিক রূপান্তর ঘটেছে স্রষ্টার ইচ্ছায়, সৃষ্টির বিকাশের তিন নম্বর পদ্ধতির মাধ্যমে। এ তিন নম্বর পদ্ধতিটি হলো পিতা ছাড়া কোন নরকোল মাতৃথলি থেকে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটানো। এখানে সরাসরি পিতা না থাকায় পিতার বৈশিষ্ট্য নতুন হিসেবে আবির্ভূত হয়। আর যার বৈশিষ্ট্য পূর্বের মতো নতুন প্রজন্ম সংক্রামিত হয়ে থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানীগণ এ পদ্ধতিতে এক প্রজাতি থেকেও অন্য প্রজাতির উদ্ভব ঘটাতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস হয়। ডারউইনের বিবর্তনবাদের কোন তথ্যই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তনবাদ পরীক্ষিতভাবে সফলতার দ্বার প্রান্তে এসে পৌছেছে। তাই জগৎ ও স্রষ্টার সম্পর্কে আস্তিকদের মাঝে আরও মহৎ ধারণার উদয় হচ্ছে।

www.pathagar.com

বিবর্তনবাদ : অতীত ও বর্তমান চিন্তা

খ্রীষ্টজন্মের বহু শতক আগে থেকেই গ্রীক দার্শনিকগণ বিশ্বাস করতেন যে, জীবন্ত সব কিছুতেই পরিবর্তনের ছোঁয়া রয়েছে। তাদের এ চিন্তা নেহায়েত দার্শনিক পর্যায়ের ধারণা। এদের ধারণা কিছু কিছু সত্য প্রমাণিত হলেও তাদের অন্যান্য ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তাদের কোন ধারণারই তেমন মূল্য ছিল না। তারপর প্রকৃতি বিজ্ঞানী লামার্ক বিবর্তন সম্পর্কে ১৮০১ সালের দিকে প্রথম যে বইটি লেখেন তার নাম "ইনোগুর‍্যাল স্পীচ"। এর আট বছর পর তিনি লেখেন "জুওলজিক্যাল ফিলোসফি" নামক আর একটি গ্রন্থ। এরপর ১৮২২ সালের দিকে প্রকৃতি বিজ্ঞানী কভিয়ার বিবর্তন সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করেন– যার নাম "হিস্টরি অব ফসিলাইজড বোনস"। তিনি এ পুস্তকে বর্তমান ও অতীতের প্রাণীসমূহের দেহাস্থির তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। তবে কভিয়ারের গবেষণা বিবর্তন সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা দিতে পারেনি। পরবর্তী কালে বাফুন নামক একজন চিন্তাবিদ, জীবজগতের বিভিন্ন প্রজাতি একটি মূল প্রজাতির থেকে উদ্ভব হওয়ার কথা চিন্তা করেন।

তার ধারণা ছিল প্রতিটি জীব প্রজাতি সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। তবে তিনি দৈহিক কাঠামোর রূপান্তর হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করতেন না। অপরদিকে লামার্কের মতে- পরিবেশগত পরিবর্তনে যখন কোন প্রজাতির জীবন ধারা বদলে যায় তখন সে প্রজাতির আকারে, গড়নে, বিভিন্ন প্রতঙ্গের অনুপাতে, রঙ্গে, দৃঢ়তায়, ক্ষিপ্রতায়, এমন কি সে প্রজাতির অধ্যাবসায়, ক্ষমতায়ও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে এবং সে প্রজাতির মাঝে নতুন চাহিদাও সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে (অভ্যাসের দরুন) তাদের দেহের কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকতর ব্যবহার ঘটতে পারে, আবার কোন কোন প্রতঙ্গ উপেক্ষিত হতে পারে। এর ফলে অব্যবহৃত অঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে যেতে পারে অথবা

www.pathagar.com

অব্যবহৃত অঙ্গটির বিলুপ্তিও ঘটতে পারে। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশগত প্রভাবের দরুন কোন জীবের গঠন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার পরবর্তী বংশধারায় সঞ্চারিত হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তবে পরিবেশগত প্রভাবে কোন অঙ্গের দৈহিক ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে কিন্তু তা বংশানুক্রমিক সঞ্চারিত হয় না। তারপর ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন সংক্রান্ত মতবাদ দিয়ে ১৮৫৯ সালে প্রকাশ করেন–"অন দি অরিজিন অব স্পেসিস" নামক একটি পুস্তক।

ডারউইন চিন্তা করেছিলেন পৃথিবীর আদি এককোষী প্রাণীর বংশানুক্রমিক ধারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ। অ্যামিবা হলো সাগরের আদি এককোষী প্রাণী। এদের থেকেই শুরু হয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ। তিনি ভেবে ছিলেন জীবের ধারাবাহিক আঙ্গিক পরিবর্তন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকার অভিব্যক্তির প্রকাশ মাত্র। যেমন পানির মাছ ডাঙ্গার পড়ে বুকে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাত পা প্রভৃতি গজিয়ে উঠলে তারা উভচর ও সরীসৃপে রূপ নেয়। খাবি খেতে খেতে জলজ প্রাণীর ফুলকা স্থলচর প্রাণীর ফুসফুসে রূপান্তরিত হয়। পরিবেশের চাপে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার চেষ্টা প্রসূত অর্জন ভিত্তিক ক্রম বিকাশের নাম বিবর্তনবাদ।

ডারউইন জীবন সংগ্রামে টিকে থাকাকে বলেছেন- যোগ্যতমের উর্দ্ধতন। জীবন সংগ্রামে জীবগুলো যে সমস্ত গুণ অর্জন করে তার ধারা বংশগতির মাধ্যমে উত্তরাধিকারগণের মাঝে সংক্রামিত হয়। তিনি চিন্তা করেছিলেন পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য প্রাণী জগতের প্রজনন কোষসমূহের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং এর ফলে গুণগত যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। তার কথা হলো দুর্বলদের বিনাশ ঘটে এবং সবলরা পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকে। প্রয়োজনে এরা তাদের আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটাতেও বাধ্য থাকে। যা পরবর্তী বংশানুক্রমেও সঞ্চারিত হয়। এতে দেখা যায় ডারউইন সব সময়ই জীবজগতের বিবর্তনের চিন্তায় পরিবেশের প্রাধান্যকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি কখনো বিবর্তনের ক্ষেত্রে স্রষ্টার হাত আছে, এ কথা চিন্তা করেননি। কিন্তু

www.pathagar.com

পরিবেশের চাপে যে সব কিছুর পরিবর্তন হয় না, তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়েছে।

প্রকৃতির মাধ্যমে যোগ্যতমের নির্বাচন নীতিকে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচন বলেছেন। তার মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি প্রজাতি অন্য একটি প্রজাতিতে রূপ নেয়। কালক্রমে প্রাণী ও উদ্ভিদের বংশগতির ধারা ধাপে ধাপে বিকাশ লাভ করেছে। অপরদিকে নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ধারা গিয়ে ঠেকেছে জটিল সপুষ্পক উদ্ভিদে। আর নিম্ন শ্রেণীর জীব প্রজাতি পর্যন্ত বানরে উন্নীত হয়ে মানুষে রূপ নিয়েছে। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদ শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিগৃহীত হয়েছে। তাই বিজ্ঞানীগণ এখন উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের কথা ভাবছেন। তবে এই বিবর্তনের ধারা যে কি, সেটি এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

আমি এ ব্যাপারে কোরআন থেকে যে তথ্য খুঁজে পেয়েছি তার আলোকে বলছি, ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনবাদের তফাৎটি হলো-ডারউইন জীবের আঙ্গিক পরিবর্তনের ব্যাপারটি জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার অভিপ্রায় হিসেবে মনে করতেন। তার ধারণা ছিল-মানুষ যেভাবে ক্রস-ব্রিডিং পদ্ধতিতে উন্নতর জাতের পশু উৎপাদন করতে পারে, তেমনি প্রকৃতি রাজ্যে জীবকুলের উন্নয়নের জন্য এমনি কোন প্রাকৃতিক পদ্ধতি বিদ্যমান আছে। কিন্তু স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন পদ্ধতির রীতিতে জীবের আঙ্গিক পরিবর্তন ও নতুন প্রজাতির উদ্ভব হওয়া এসবই স্রষ্টার অভিপ্রায়ের ওপরই নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে স্রষ্টার নির্দেশে তথ্য কণার পরিবর্তন ও সংযোজনের মাধ্যমেই নতুনের উদ্ভব ঘটেছে।

আল-কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"আল্লাহই প্রত্যেক জিনিসকে এর আকার ও প্রকৃতি দান করেছেন।" (সূরা ত্বাহা ২০ : আয়াত ৫০)

আল্লাহর সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে দৈবের কোন আশ্রয় নেই। সব কিছুতে রয়েছে বৈজ্ঞানিক কৌশল। একটা বানর দাঁড়িয়ে আছে আর আল্লাহ বলে দিলেন, মানুষ হয়ে যা, এতেই বানরটি মানুষ হয়ে গেল; এভাবে পয়দা করার কোন নীতি আল্লাহ তায়ালা অবলম্বন করেননি। কিংবা বিভিন্ন স্থানের মাটি

www.pathagar.com

আনিয়ে মূর্তি বানানোর পর বললেন, মানুষ হয়ে যা, এভাবেও সৃষ্টি করেছেন, এর কোন প্রমাণ নেই। বরং এমন করেছেন যেমন–মা আছে পিতা নেই। তবু বলে দিয়েছেন, ঐ মায়ের গর্ভ থেকে সন্তান হোক। এ ক্ষেত্রে পিতার স্পর্শ ছাড়াই মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান হওয়ার প্রমাণ আছে। কিন্তু এখানেও মা দ্বৈব ক্রমে গর্ভবতী হয়নি। বরং এ ক্ষেত্রে মাটি ও পানির উপাদান দিয়ে আল্লাহর হুকুমেই শুক্রাণু সৃষ্টি হয়ে তা ঐ মার ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার পরই তার গর্ভ থেকে সন্তান হয়েছে। আবার দু'টি ভিন্ন গঠনের (একই গোত্রভুক্ত) প্রাণীর প্রজননের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে। এমনকি মানুষের গর্ভ থেকেও ভিন্ন আকৃতির প্রাণীর জন্ম হওয়ার কথা শুনা যায়। সকল ক্ষেত্রে প্রাণী ও উদ্ভিদের বিচিত্র গঠন ও বৈশিষ্ট্য স্রষ্টার ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল। স্রষ্টার ইচ্ছামাফিক আঙ্গিক পরিবর্তনের জন্য যে সব তথ্য প্রেরণ করেছেন– এর থেকেই প্রাণীর বিচিত্র ধরনের আকার সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রতিটি প্রাণী হলো তথ্য কণার ভাণ্ডার। স্রষ্টা থেকে তথ্য প্রেরীত হয় তরঙ্গের মাধ্যমে। ফলে মূল জিনিসটির একত্রে নাম হবে তথ্য– তরঙ্গ বা তথ্যকণা কিংবা তথ্য কাঠামো। আর মূল প্রাণীটি হবে অগণিত তথ্য কণার সাজানো সারি। যিনি অসংখ্য তথ্য দিয়ে প্রতিটি জীবকে আকার-আকৃতি ও স্বভাব দান করেছেন তিনিই আমাদের সকলের পালন কর্তা। তাঁর উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন ধারার চূড়ান্ত রূপ হলো আদমের আবির্ভাব। তার মাধ্যমেই জগতের সকল মানুষের উৎপত্তি। এ ধরনের বিবর্তন আল-কোরআনের মাধ্যমেও স্বীকৃত।

www.pathagar.com

জীবের আদি উৎসের সাথে পানির সম্পর্ক

যখন কোন কিছুর শুরু নিয়ে চিন্তা করা হয় তখন ভাবা হয় ঐ জিনিসটা কিভাবে তৈরী হলো?

কি উপাদান দিয়ে তৈরী করা হয়েছে? কোথায়, কখন হয়েছে? কে বানিয়েছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এত সব প্রশ্নের উত্তর যে আমরা দিতে পারব এমন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। আমরা জীব প্রজাতির অংশ হিসেবে জীবের আদি উৎস সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ পৃথিবীতে মানব প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে সৃষ্টির সূচনার কোটি কোটি বছর পর। সেজন্য আমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে অনুমানের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। তাই আমাদের অনুমান হয় আপেক্ষিক। এটা স্থান-কালের পরিসরে কখনো সত্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

জগতের সকল কিছু কে বানাল? এ প্রশ্নের জবাব বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। কারণ যিনি এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাকে সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয় বিধায় বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে চলতে থাকলে শেষ পর্যায়ে এমন এক সত্তার সন্ধান পাওয়া যায় যিনি চিরন্তন সত্তা। তিনিই জগতের সকল কিছুর সৃষ্টি করেছেন। আমরা যাঁকে জগতের চিরন্তন সত্তা হিসেবে পেলাম তিনিই পরম প্রতিপালক আল্লাহ।

আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা করেছেন–

"আল্লাহ সৃষ্টিধারা প্রবর্তন করেন তারপর পুনারাবৃত্তি করেন।" (৩০ : ২৭)

আল্লাহ তা'য়ালা জগতের সকল জীব, উদ্ভিদ, বস্তু ও বস্তুর উপাদানের স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টির সূচনা ও পুনঃসৃষ্টি প্রবর্তন করেন। সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রেই সৃষ্টির মূল উপাদান, স্থান-কাল ও অনুকুল পরিবেশ জড়িত রয়েছে। কোন জীবকেই আকাশ থেকে মাটিতে ফেলে দেয়া হয়নি। সে হিসেবে পানিই হলো জীবের আদি উৎস। এটা যেমন বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত তেমনি আল-

www.pathagar.com

কোরআনেও উদ্ধৃত হয়েছে ১৪০০ বছর আগে। তাই পানির সাথে জীবের আদি উৎসের সম্পর্ক রয়েছে।

আল্লাহ বলেন–

"আল্লাহ সমস্ত প্রকারের প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে।" (সূরা আন নূর : আয়াত ৪৫)

"(আল্লাহ) সেই একক সত্তা যিনি মানুষকে পানি থেকে গঠন করেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন বংশধারা (পুরুষের মাধ্যমে) এবং আত্মীয়তার ধারা নারীদের মাধ্যমে।" (সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৪)

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রে মিলিত ছিল? পরে আমরা তাদের পৃথক করেছি এবং আমরা প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে বের করেছি পানি থেকে? তার পরও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৩০)

আল্লাহ তায়ালার বাণী থেকে আমরা এই ধারণাই নিতে পারি যে, সৃষ্টির প্রতিটি জীবন্ত জিনিসের অপরিহার্য উপাদান পানিতেই ছিল এবং পানি থেকেই মানুষসহ জীবন্ত সকল কিছুর উৎপত্তি ঘটেছে। সেই হিসেবে মানুষের আদি উৎস হলো পানি। কিন্তু মানুষ পানিতে বাস করে না। তাদের আবাসস্থল হলো স্থলভাগ। কিন্তু পানিতে যাদের আদি উৎস তারা স্থলভাগে এলো কি করে? এর জবাবে বলা যায়, স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন ধারাই এর প্রকৃত মাধ্যম।

পানির জীব ডাঙ্গায় বাস করলেও দেখা যায় ডাঙ্গার জীবের দেহ কোষে রয়েছে ৭০ ভাগ পানি। পানি ছাড়া জীবন ধারণ অসম্ভব। বিজ্ঞানীগণ গ্রহান্তরে জীবনের (প্রাণের) সন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই খুঁজেছেন পানির অস্তিত্ব। কারণ পানি হলো জীবনের অপরিহার্য উপাদান। তাই অনুসন্ধান করে দেখা গেছে পৃথিবীতে আদিতে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে পানি থেকেই। পৃথিবীর আদি এককোষী অ্যামিবার উৎপত্তি হয় সাগরের লোনা পানিতে। তার গঠন প্রকৃতি আশ্চর্যজনক ও রহস্যময় এবং জটিল। এর মধ্যে রয়েছে প্রোটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস। এদের রাসায়নিক গঠনও জটিল। আবার

www.pathagar.com

নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজমের একটি অংশ হলো 'জিন'। এর মাধ্যমেই লুকিয়ে থাকে বংশগতির গোপন তথ্য।

জীবকোষের বেশীর ভাগ অংশই পানি এবং বাকি অল্প কিছু থাকে গ্যাসীয় উপাদান। এদের দিয়ে গঠিত জীবকোষের প্রোটোপ্লাজম নামক অতি জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থটির কর্ম চাঞ্চল্যই জীবনকে গতিময় করে রাখে। জীবকোষের অভ্যন্তরে জীবন নামের একটা স্পন্দন বিরাজ করে। সুস্থ প্রাণীর হৃৎপিণ্ড যেমন নিজের থেকেই স্পন্দিত হতে থাকে তেমনি জীবকোষের মৌল ও যৌগের অনুপাত এবং অনুকুল পরিবেশ টিকে থাকলে নিজে থেকেই সেটি স্পন্দিত হতে থাকে। একটা কলেরার রোগীর শরীরের জলীয় অংশ (লবন পানি) বের হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ড সতেজ থাকলেও সেটির স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি জীবকোষের অভ্যন্তরীণ পানি ও অন্যান্য উপাদানের আনুপাতিক সাম্যতা বজায় না থাকলে সেটিতে স্পন্দন বা প্রাণের অস্তিত্ব খুব পাওয়া যাবে না। এখানে স্পন্দন হলো স্রষ্টার Information bit, এটিই জীব নামের রহস্যময় সত্তা। একে পৃথিবীতে ধরে রাখার উপযুক্ত মাধ্যম হলো পানি।

একটা ক্যাসেটের ফিতায় যেমন-বিভিন্ন সঙ্গীত ধারণ করে রাখা হয়, তেমনি পানি হলো পৃথিবীতে জীবনকে (Information bit) বন্দি করে রাখার মূল উপাদান। সেটা যেমন পানির জীবের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য তেমনি ডাঙ্গার জীবের ক্ষেত্রেও সমভাবে কার্যকরী। তাই পানির অপর নাম বলা হয় জীবন। অর্থাৎ জীবনকে পৃথিবীতে ধারণ করে রাখার জন্য পানি হলো মূল উপাদান। সেটা পানি কিংবা ডাঙ্গার জীবের ক্ষেত্রে সমভাবেই কার্যকরী। তাই ডাঙ্গার জীবের আদি উৎস হলো পানি। অর্থাৎ ডাঙ্গার জীবের প্রাণ সত্তাকে ধরে রাখার জন্য তার উৎপত্তি ঘটানো হয়েছে পানি থেকেই। তাই পানির সাথে পানির ও স্থলের জীবের সম্পর্ক খুব নিবীড়।

www.pathagar.com

পানির জীব ও স্থলের জীবের সম্পর্ক

পানির জীব পানিতে জন্ম হয়েছে, একথা আমরা সহজেই মেনে নেই। আবার যদি বলা হয় স্থলের জীবের আদি উৎস হলো পানি, তখন কি আমরা তা সহজেই বিশ্বাস করি? সত্যিকার অর্থে দেখা যায় একথাটি আমরা সহজে বিশ্বাস করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাই। কিন্তু যখনি এর পেছনে নির্ভুল যুক্তি পেশ করা হয় তখন বিশ্বাস করতে কোন বাধা থাকে না। কার্যতঃ দেখা যায় স্থলের জীবের জীবকোষ আর পানির জীবের জীব কোষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যদি এমন হতো যে, স্থলের জীবের জীবকোষে পানি নেই, তবে আমরা বলতে পারতাম যে স্থলের জীব স্থলেই জন্ম হয়েছে, কিন্তু স্থলের জীবের জীব কোষে যেহেতু পানি রয়েছে, সুতরাং বলা যায় এদের বংশগতির ধারা পানি থেকেই শুরু হয়েছে। পানির জীব ও স্থলের জীবের মধ্যে সম্পর্ক হলো উভয়ের জীবকোষের গঠন ও কার্যপ্রণালী প্রায় একই। তবে স্থলের জীবের জীবকোষে রয়েছে ৭০ ভাগ পানি আর পানির জীবের জীবকোষে ৯৮ ভাগ পানি। এছাড়া অন্যান্য সকল দিক থেকে উভয়ের পরিমাপে কোন তফাৎ নেই।

পৃথিবীর সমস্ত জীবের আদি উৎস যে পানি থেকে হয়েছে তা আল কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে।

"সব জীবকে আল্লাহ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এদের কোনটি হামাগুড়ি দিয়ে চলে; কোনটি চলে দু'পায়ে আর কোনটি চলে চার পায়ে।" (সূরা আন নূর : আয়াত ৪৫)

পানি থেকে যে জীবের উদ্ভব হয়েছে, সেটি স্থলে এলো কিভাবে? এ প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তাদের আবাসস্থল অনুযায়ী এদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন জলচর প্রাণী, উভচর প্রাণী এবং স্থলচর প্রাণী। এখানে দেখা যায় পানির জীব ডাঙ্গায় উঠে থাকতে পারে না। আবার স্থলের জীব পানিতে ডুবলে মারা যায়। অপরদিকে উভচর প্রাণী জলে ও স্থলে উভয় স্থানে বাস করতে পারে।

www.pathagar.com

পানি ও উভচর প্রাণীর জীবকোষের মধ্যে খুব তফাৎ না থাকলেও অঙ্গের দিক থেকে অনেকটা তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। যেমন পানির জীবের পা নেই বললেই চলে কিন্তু উভচর জীবের হাত, পা আছে। আবার স্থলের প্রাণীরও হাত-পা আছে। এখানে দেখা যায় উভচর ও স্থলের প্রাণীর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম মিল রয়েছে। মূলত পৃথিবীতে প্রত্যেক প্রজাতির প্রথমে আদি বংশধারা প্রবর্তিত হয়। তারপর সেই সৃষ্টিরধারা থেকে বংশগতির ধারার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। যেমন অ্যামিবা বা এককোষী প্রাণীর বংশগতির তথ্য যেমন জিনগুলো বহন করে তেমনি বহুকোষী প্রাণী বা স্থলের জীবের বংশগতির তথ্যও জিনেরাই বহন করে। পর্যায়ক্রমে বা ধাপে ধাপে সৃষ্টির সাংগঠনিক বিবর্তন ধারায় পৃথিবীর প্রথম প্রজাতির বংশধর বহুকোষী প্রাণীতে রূপ নিলেও পানির জীব পানিতে বাস করতে থাকে। ধারণা করা যায় অতীতে বিবর্তনের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম সাংগঠনিক রীতি কাজ করেছে। এ পদ্ধতিতে বার বার পুরাতন প্রজাতি থেকে জিন রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। অর্থাৎ প্রকৃতিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে জিন রূপান্তরের মাধ্যমে সেখানে নতুন তথ্য কণার সংযোজন করা হলে পানির জীব থেকে উভচর জীবের বাচ্চা প্রসব হয়। অতঃপর আবার প্রকৃতিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে উভচর জীবের ক্ষেত্রেও জিন রূপান্তর ঘটে। ফলে উভচর জীবের বাচ্চা পানিতে বাস করার অনকূল অঙ্গ হারিয়ে ফেলে এবং ডাঙ্গায় বাস করার মতো উপযোগী অঙ্গ লাভ করে। এক্ষেত্রে প্রতি ধাপে ধাপেই অনুকূল পরিবেশের জন্য অনেক অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। অত:পর এভাবেই বিবর্তনের মাধ্যমে পানির জীব থেকে ডাঙ্গার জীবের উদ্ভব ঘটেছে। এখানে স্রষ্টার মহতী ইচ্ছাতেই জিন রূপান্তর ঘটেছে। যখনি স্রষ্টা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির উদ্ভব ঘটিয়েছেন তখন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার "তিন নম্বর" রীতি কাজে লাগিয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় পিতার সংস্পর্শ ছাড়াই মাতৃগর্ভ থেকে নতুনের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। তাই পানির জীবের 'জিন' যে তথ্য বহন করেছিল, সেগুলো এখনো ডাঙ্গার জীবের জিন বহন করে আসছে।

www.pathagar.com

তাই দেখা যায় শারীরিক কাঠামো যত ভিন্নই হোক না কেন তবু কোন না কোন দিক থেকে পানির জীবের সাথে উভচর ও স্থলের জীবের মিল রয়েছে। যদি উভয়ের মাঝে কোষগত মিল না থাকত তবে পৃথিবীর মানুষ পানির মাছ ও স্থলের প্রাণীর গোশ্‌ত খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারত না।

সৃষ্টির কাঠামোগত ভিন্নতা সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা মাঝে মাঝে সৃষ্টিতে নতুন নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন। এর ফলে নতুনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণাও রয়েছে :

"আল্লাহ সৃষ্টিধারা প্রবর্তন করেন তারপর পুনরাবৃত্তি করেন।" (সূরা রূম : আয়াত ২৭)

উপসংহারে বলা যায় জীব জগতের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে একটা সাংগঠনিক বিবর্তন বা উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন প্রচলিত ছিল। এ বিবর্তন ডারউইনের বিবর্তন নয়। ডারউইনের বিবর্তন ও স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। সৃষ্টিতে উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন চালু ছিল বলেই প্রতিটি জীবে মননবোধ কাজ করে। যখন নতুন প্রজাতির জীব সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখনি স্রষ্টা পুরানো প্রজন্ম থেকে নতুনের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। এভাবেই পানির জীব বিবর্তনের রশি বেয়ে বেয়ে স্থলে উঠেছে। তাই পানির জীবের জীবকোষের সাথে ডাঙ্গার জীবের জীবকোষের রয়েছে পুরোপুরি মিল।

www.pathagar.com

মানুষ সৃষ্টিতে পানির প্রকারভেদ

"আল্লাহ মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেন- পরে তিনি বংশগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন।" (সূরা ২৫ : আয়াত ৫৪)

"আল্লাহ সমস্ত প্রকারের প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে।"

(সূরা ২৪ : আয়াত ৪৫)

"(মানুষ) কি সেই সামান্যতম শুক্র ছিল না! যা সজোরে নির্গত হয়েছিল।।" (সূরা ৭৪ : আয়াত ৩৭-৩৮)

"অত:পর আল্লাহ তৈরী করেছেন তার (মানুষের) বংশধারা তুচ্ছ তরল পদার্থের সার নির্যাস থেকে। (সূরা ৩২ : ৮)

"নিশ্চয় আমরা মানুষকে গঠন করেছি সামান্য পরিমাণ সংমিশ্রিত তরল পদার্থ থেকে।" (সূরা ৭৬ : আয়াত ২)

"তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে।" (সূরা ৮৬ : আয়াত ৭)

মানুষ সৃষ্টিতে যে সব পানির কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হলো শুধু পানি, তুচ্ছ পানি, সবেগে স্খলিত পানি। আল-কোরআনের ২৫ (৫৪) আয়াতে মানুষকে সরাসরি শুধু পানি থেকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। অপর দিকে ২১ (৩০), ২৪ (৪৫) আয়াতে সমস্ত জীবন্ত জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এখানে ২৫ (৫৪), ২৪ : ৪৫ ও ২১ : ৩০ আয়াতে যে পানির কথা বলা হয়েছে সে পানি সমুদ্র, নদীনালা, খালবিলের পানির সাথে সম্পর্কিত। এর অন্য কোন বিশেষণ নেই। এ পানি শুক্র মিশ্রিত বীর্যের ন্যায় বিশেষণযুক্ত পানি নয়। এসব (২৫ : ৫৪, ২১ : ৩০, ও ২৪ : ৪৫) আয়াতের ব্যাখায় অনেক তফসিরবিদগণ পানিকে জীবনের কারণ ও জীবনের উৎস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অনেক তাফসিরবিদগণ এ বিশেষণহীন পানিকে পুরুষের বীর্য মিশ্রিত পানি হিসেবে ধরে নিয়ে আয়াতের সঠিক অর্থকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তারা শুধু পানি এবং বীর্য (শুক্র) মিশ্রিত পানি যে এক নয় তা তলিয়ে দেখেননি। অর্থাৎ

www.pathagar.com

শুধু পানিতে থাকে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন নামের দু'টি মৌলিক পদার্থ। এগুলো একত্রে মিলিত হয়ে পানি নামের যৌগিক পদার্থ গঠিত করেছে।

আর পুরুষের বীর্য (শুক্র) মিশ্রিত পানি হলো অন্ডকোষ (Testis) ও Prostate (প্রোস্টেট) গ্রন্থির (Glands) নিঃসরণ। এতে থাকে শুক্রাণু। এ ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য glands-এর নিঃসরণ। সব মিলে এ তরল পদার্থ খুব পিচ্ছিল ও আঠালো থাকে, এর ফলে শুক্রাণুগুলো সহজে তার মধ্যে ভেসে বেড়াতে ও দ্রুত নির্গত হতে পারে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমুদ্র, নদী-নালা. খালবিলের পানি আর পুরুষের বীর্য (শুক্র) মিশ্রিত পানির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। যেমন আমরা যদি সারা সমুদ্রের পানি খুঁজি তাহলে একটি শুক্রাণু পাব কিনা সন্দেহ। অপর দিকে পুরুষের একবার সঙ্গমে যে বীর্য নিঃসৃত হয় তাতে কোটি কোটি শুক্রাণু থাকে। তাই বিশেষণধর্মী (তুচ্ছ পানি ও সবেগে স্খলিত পানি) পানির সাথে বিশেষণহীন পানি এক করে দেখা উচিত নয়। বরং এ ক্ষেত্রে উচিত হবে কিভাবে শুধু পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি হতে পারে তা আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আদিকালে কোন এক সময় প্রোটোপ্লাজম নামের এককোষী জীব পানিতেই সৃষ্টি হয়েছিল। এটি একটি জীবন্ত জীবকোষ। এ প্রোটোপ্লাজমের বংশগতির ধারা বিবর্তনের মাধ্যমে উন্নতর জীব মানুষে উন্নিত হয়েছে। মানুষের দেহ কোষে রয়েছে জীব কোষের সমাহার। এসব জীব কোষগুলো ইটের সারির মতো দেহে সাজানো থাকে। এদের কর্ম চাঞ্চল্যই বহুকোষী প্রাণীকে জীবন সংগ্রামে টিকিয়ে রাখে।

এ পর্যায়ে একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। ঢাকায় একটি ২০ তলা দালান আছে। এটি কোথাকার, কি উপাদান দিয়ে তৈরী করা হয়েছে, প্রশ্ন করা হলো। উত্তর দিতে গিয়ে বলা হলো নারায়ণগঞ্জের পানি দিয়ে। তারপর আবার অন্যত্র বলা হলো মাটি ও সিমেন্ট এবং বালির কথা। এই উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এক সময় নারায়ণগঞ্জের

www.pathagar.com

শুধু পানিই ছিল। পানি থেকেই বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে মাটি। এই মাটি আর পানি মিশিয়ে পুড়িয়ে তৈরী করা হলো ইট। আর সিলেট থেকে আনা হলো সিমেন্ট আর বালি। এবার ইট, সিমেন্ট, বালি পানি মিশিয়ে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রক্রিয়াগতভাবে দালানটি তৈরী করা হলো। এটি তৈরী করতে শ্রমিক, সময়, পরিকল্পনা, পরিকল্পনাকারীর উদ্দেশ্য একত্রে কাজ করেছে। এবার যদি দালানটি তৈরীর ক্ষেত্রে ভেঙ্গে ভেঙ্গে জবাব দেয়া হয় এটি তৈরী হয়েছে পানি থেকে। আবার কখনো যদি বলা হয় মাটি, সিমেন্ট থেকে, কিংবা ইট দিয়ে। তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কি নেই। মূলত এক সময় পৃথিবীতে শুধু পানিই ছিল। তারপর সৃষ্টি হয়েছে মাটি, বালি, পাথর (সিমেন্ট তৈরীর উপাদান) ইত্যাদি। তাই পানি থেকে দালানের সূচনার কথা বলা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিংবা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে মাটি, বালি, সিমেন্টের কথা বলা হলেও তাতে কোন অবাস্তবতা বা অসত্য কিছু থাকবে না।

মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়াতে পানি ও মাটির কথা এসেছে। মানুষের দৈহিক কাঠামোতে রয়েছে পানি ও বিশুদ্ধ কাদা মাটির সারভাগ। অর্থাৎ মানুষের দেহে পানি ও মাটির সকল উপাদান মওজুদ রয়েছে। তবে মানুষের দেহ যে ইট (জীবকোষ) দিয়ে তৈরী তা পানিতেই সৃষ্টি হয়েছে। পানির এই আদি প্রাণ সত্তা স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন ধারায় যখন স্থলের জীব হিসেবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন এতে কাদা মাটির সার অংশও যোগ হয়েছে। তাই সূচনার ক্ষেত্রে শুধু পানির কথা এসেছে। এ ধরনের সৃষ্টিতে যৌন মিলনের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু বিশেষণধর্মী পানির মাধ্যমে সৃষ্টির ক্ষেত্রে যৌন মিলনের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের দরকার আছে। আল-কোরআনের ৭৪ (৩৭ : ৩৮), ৩২ (৮), ৭৬ (২), ৮৬ (৭) ইত্যাদি আয়াতে যে পানির কথা বলা হয়েছে, তাহলো বিশেষণধর্মী পানি। পুরুষের বীর্যকে সাধারণত এ পানি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে পদ্ধতিতে মানুষ জন্ম হয় সেখানে এ ধরনের বিশেষণধর্মী পানির প্রয়োজন। এর মাধ্যমে বংশগতির ধারা বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে, শুধু পানি (বিশেষণহীন) এবং কাদা মাটির সারভাগ দিয়ে মানুষ সৃষ্টির কথা বলায় আমাদেরকে বুঝতে হবে যে পৃথিবীতে জন্ম পদ্ধতি একটি মাত্র প্রচলিত পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হয়নি। মূলত মানুষ সৃষ্টির চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছতে তিন ধরনের জন্ম পদ্ধতি কাজ করেছে। যেমন প্রথমতঃ মাতা-পিতা ছাড়া জন্ম হওয়া (একক প্রাণ সত্তা হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভাব), দ্বিতীয়তঃ পিতা-মাতার যৌন মিলনে জন্ম হওয়া (বর্তমান জন্ম পদ্ধতি), তৃতীয়তঃ পিতার সাথে যৌন মিলনহীন পদ্ধতি (বিবি মরিয়মের গর্ভ থেকে ঈসা (আ) জন্ম হওয়ার ন্যায়)।

এ অধ্যায়ে যে দু'ধরনের পানির কথা বলা হয়েছে তাতে ১ম ও ২য় পদ্ধতিতে মানুষের জন্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১ম পদ্ধতিতে প্রাথমিক পর্যায়েই পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি না হলেও মানুষ সৃষ্টির মূল ভিত্তি সৃষ্টি হয়। অপরদিকে ২য় পদ্ধতির জন্ম তরিকা এখনও চালু আছে। এ সম্পর্কে আমরা অবহিত আছি। কিন্তু কাদা মাটির সারভাগ দিয়ে মানুষ সৃষ্টির কথাতে পিতার সাথে যৌন মিলনহীন পদ্ধতির অতি গোপন রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। মূলত এ পদ্ধতিতে মানুষের জন্ম হওয়া খুবই রহস্যময় ও জটিল। উপসংহারে বলা যায় আমরা যদি যৌন সঙ্গমহীন কাদা মাটির সারভাগ দিয়ে মানুষ সৃষ্টির পদ্ধতিটি সম্পর্কে অবহিত হতে পারি তবেই আদমের দুনিয়ায় আবির্ভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাব।

www.pathagar.com

মানুষ সৃষ্টিতে মাটির গুরুত্ব

"তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন মাটি থেকে।"

(সূরা ১১ : আয়াত ৬১)

"আমরা তোদেরকে গঠন করেছি বা সৌষ্ঠব দান করেছি মাটি থেকে।"

(সূরা ২২ : আয়াত ৫)

"(আল্লাহ) মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে।" (সূরা ৩২ : আয়াত ৭)

"আমরা তাদেরকে গঠন করেছি আঠালো মাটি থেকে।" (সূরা ৩৭ : আয়াত ১১)

"আমরা গঠন করেছি মানুষকে কাদামাটির বিশুদ্ধ সারভাগ থেকে।"

(সূরা ২৩ : আয়াত ১২)

পরম প্রতিপালক রাব্বুল আলামীন মানুষকে পানি থেকে (২৫ : আয়াত ৫৪), তারপর তুচ্ছ তরল পদার্থের সার নির্যাস (৩২ : ৮) বা বীর্য (শুক্র) থেকে সৃষ্টি করার কথা বলে শেষ করে দেননি।

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোতে মানুষ সৃষ্টিতে মাটি এবং কাদামাটির বিশুদ্ধ সারভাগের কথাও এসেছে। আগের অধ্যায়ে শুধু পানি ও তুচ্ছ তরল পদার্থের সার নির্যাসের মাধ্যমে কিভাবে মানুষ সৃষ্টি হতে পারে তা উল্লেখ করেছি। এখানে কাদামাটির বিশুদ্ধ সারভাগ থেকে মানুষ সৃষ্টির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি।

মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষের বসবাস। এ মাটিতে রয়েছে- ক্যালসিয়াম, আয়রণ, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সালফার ইত্যাদি। মাটির এসব উপাদান রয়েছে মানুষের দেহ কোষেও। মা বাবার যৌন মিলনের পর প্রচলিত প্রজনন রীতিতে মার গর্ভে সন্তানের আবয়ব (জড়দেহ) তৈরী হয় মাটির এসব উপাদানের মাধ্যমে। মা খাদ্য থেকে এসব উপাদান আহরণ করে। এভাবে ২৮০ দিন বা ৪০ সপ্তাহ পূর্ণ হলে মাতৃগর্ভ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর জন্ম হয়। তারপর এসব শিশুরাই দিনে দিনে বড় হয়ে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানবে পরিণত হয়। তাদের মধ্যে ছেলে কিংবা মেয়ে উভয়েই হতে পারে। এক সময় বড় হলে তাদের মাঝে যৌবনের সাড়া পড়ে। তখন

www.pathagar.com

তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এভাবে তাদের থেকেও সন্তান-সন্ততি হয়। এর মাধ্যমে বংশধারা ও আত্মীয়তার ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা হলো যৌন প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার রীতি। কিন্তু ৩২ (৭) আয়াতে কাদা থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করার যে উল্লেখ রয়েছে তা কিভাবে? সেটা কি কাদামাটির মূর্তি (হিন্দুদের মূর্তি ন্যায়) তৈরী করে সৃষ্টি করা হয়েছে?

এর উত্তরে বলা যায়, এভাবে সৃষ্টির উদ্ভব ঘটানো আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার রীতি বিরুদ্ধ।

"(আল্লাহ) গঠন করেছেন মানুষকে কাদা থেকে মৃৎশিল্পের মত করে।" (সূরা ৫৫ : আয়াত ১৪)

"আমরা মানুষকে গঠন করেছি কাদা হতে, নকশা কাটা নরম মাটি থেকে।" (সূরা ১৫ : আয়াত ২৬)

মৃৎ শিল্পীগণ যে জিনিস তৈরী করেন তার জন্য আগেই একটি "ডাইস" বানিয়ে নেন। তারপর কাদামাটি ঐ ডাইসে নিয়ে জিনিসটি তৈরী করেন, সেটা হাড়ি-পাতিল কিংবা কলসি ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে। পরম প্রতিপালক আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির (খেলাফতধারী মানুষ) আগেই পৃথিবীতে মানুষের আকৃতি বা নমুনা তৈরী করার জন্য মৃৎশিল্পীর চেয়েও উন্নতর মানে "ডাইস" বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেই ডাইস কাঠের তৈরী কোন ফর্মা নয়। এটি হলো এখনকার মায়েদের মাতৃথলির ন্যায় জীব মানবীর মাতৃথলি।

জীব মানুষের ক্রমবর্ধমান রূপান্তর ও বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রতিবারই তার কাছাকাছি কোন মানব প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটানোর আগে নতুন মানব প্রজাতির আগমনের ক্ষেত্রে তার পূর্বতন মানব প্রজাতির মানবীর মাতৃথলি "ডাইস" হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এসব ঘটনা ঘটেছে মহান স্রষ্টার মহতী ইচ্ছায়। এক্ষেত্রে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটানো হয় যৌনমিলন বহির্ভূত প্রক্রিয়ায়। একে আমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার তিন নম্বর রীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছি। আমি আগেও উল্লেখ করেছি, এ রীতিতে ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়েছিল। পাশাপাশি হযরত আদম (আ)-এর জন্মও এ রীতিতে হয়েছিল (আল্লাহ ভাল জানেন)। এ ব্যাপারে আমি অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি।

মানুষের দৈহিক গঠন বর্তমান পর্যায়ে আসতে পর্যায়ক্রমে অনেক রূপান্তর সাধিত হয়েছে। সে রূপান্তর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় স্রষ্টার

www.pathagar.com

ইচ্ছায় ঘটেছে। সূরা আনআমের ১৩৩ আয়াতে ও সূরা দাহরের ২৮ আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। তাই বলা যায় বর্তমান উন্নততর মানুষের উদ্ভব ঘটানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই পশু শ্রেণীর মানুষের মাতৃথলি "ডাইস" হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার তিন নম্বর রীতি ব্যবহার করা হয়। এখানে শুক্রকীট পিতার মাধ্যমে মাতৃথলিতে প্রোথিত হয়নি। বরং এখানে স্রষ্টার অসীম ক্ষমতায় মাটি পানির মাধ্যমে একক প্রাণ সত্তা বা শুক্রকীট সৃষ্টি হয়ে তা মাতৃথলিতে (জরায়ুতে) প্রোথিত হয় এবং সেই মাতৃথলি থেকেই আধুনিক মানুষের আদি মাতা-পিতার জন্ম হয়।

আল্লাহ বলেন-

"মাটি থেকে আমরা মানুষকে পয়দা করেছি। প্রথমে একটি অতি ক্ষুদ্র জীবাণু গড়েছি এবং তাকে নিরাপদ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তারপর সেই জীবাণুকে ক্রমে একটি রক্তের গুটিকায়, পরে একটি গোশত খণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর তাতে অস্থিসমূহ সৃষ্টি করে গোশত ও পেশী দ্বারা আবৃত করেছি। তারপর তাকে একটি স্বতন্ত্র মানুষে পরিণত করেছি। এরপর একদিন অবশ্যই তোমাদের মৃত্যু আসবে এবং মহা বিচারের দিন তোমাদেরকে পুনরায় উত্থিত করা হবে।" (সূরা মুমিনুন : আয়াত-১-৯)

মাটির সারভাগ দিয়ে তৈরী একক জীবকোষটি (অতি ক্ষুদ্র জীবাণু) অবশ্য রাখা হয়েছিল কোন না কোন মাতার মাতৃথলি বা জরায়ুতে (নিরাপদ স্থানে)। কারণ সন্তান জন্ম হওয়ার ক্ষেত্রে জরায়ুর চেয়ে নিরাপদ স্থান আর কোনটিই নেই। তাছাড়া অন্যত্র রাখলে সেটি থেকে স্বতন্ত্র মানুষ জন্ম হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এ ক্ষেত্রে আধুনিক মানুষ পয়দা করার জন্য বর্তমান মানুষের কাছাকাছি কোন প্রজাতির মায়েদের জরায়ুতেই মাটির তৈরী অতি ক্ষুদ্র জীবাণুটি রাখা হয়েছিল। ঐ মাতৃথলিটি মৃৎশিল্পীর ডাইসের ন্যায় কাজ করেছে। এ ধরনের জন্ম প্রক্রিয়া স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন পদ্ধতি। তাই মানুষের সৃষ্টিতে শুধু পানির যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি মাটির গুরুত্বও অপরিসীম। ফলে মানুষের জীবকোষে রয়েছে পানি ও মাটির সকল উপাদান।

মানুষ (আদম) পয়দা করতে যেহেতু নিরাপদ স্থানের (জরায়ুর) প্রয়োজন হয়েছিল তাই পৃথিবীতে আদমের আগেও যে নিম্নধাপের মানুষের অস্তিত্ব

www.pathagar.com

ছিল, তার প্রমাণ মেলে। নৃ-বিজ্ঞানীগণ সে সব বিলুপ্ত হওয়া মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে বের করছেন?

মানুষ সৃষ্টিতে শুধু পানি এবং কাদামাটির উভয়ের কথা থাকায় এটা উপলব্ধি করা যায় যে, পানির এককোষী জীব স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে বহুকোষী জীবে রূপান্তরিত হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলাফতধারী মানুষে পরিণত হয়েছে। এ রূপান্তর প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটেনি। বরং তা ঘটেছে আল্লাহ তা'আলার পরম ইচ্ছায়। এটাই আমাদের মূল বিশ্বাস।

কিন্তু আমাদের মাঝে অনেক অতি বুদ্ধিমান লোক আছেন যারা মানুষকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুনেই ধারণা করে বসেছেন, মানুষকে (আদমকে) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মাটি একত্র করে মূর্তি বানিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যাখ্যাটি গবেষণাহীন পৌরাণিক কাহিনী থেকে আমাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা হিসেবে মানুষের বিশ্বাসমূলে শিকড় গেড়ে বসেছে। এটি একটি বড় ধরনের কুসংস্কার ?

বর্তমান মানুষের চূড়ান্ত ধাপ উন্নতির শিখরে পৌঁছতে বিভিন্ন রূপান্তর ও পরিবর্তনের স্তর ডিঙ্গিয়ে এখানে আসতে হয়েছে। এটা জীবের জেনেটিক রূপান্তরের (Mutation) এর মাধ্যমেই ঘটেছে।

"(আল্লাহ) গঠন করেছেন তোমাদেরকে উন্নতির নানা মাত্রায় (পর্যাক্রমে-বিভিন্ন পর্যায়ে ধাপে ধাপে)।" (সূরা নূহ : আয়াত ১৪)

"আমরা মানুষকে গঠন করেছি সর্বোত্তম সাংগঠনিক পরিকল্পনা অনুসারে।" (সূরা তীন : আয়াত ৪)

মানুষ প্রজাতির উন্নতির শেষ প্রান্তে আসতে তাই তার আগের অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। জীব প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটানো একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। অতএব বুঝা যায় আদমের আগেও মানুষ প্রজাতির অনেক নিম্নধাপ পৃথিবীতে ছিল। জেনেটিক বিলুপ্তির (Genetic drift) মাধ্যমেই এদের বিলুপ্তি ঘটেছে।

"নিশ্চয় আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের সবাইকে করেছি শক্তি সম্পন্ন (বা তাদের গঠনকে মজবুত করেছি) এবং যখন আমরা ইচ্ছা করেছি তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিয়ে (অথবা বদলিয়ে দিয়ে) তদস্থলে অনুরূপ ধরনের মানুষকে স্থলাভিষিক্ত করেছি।" (সূরা দাহর : আয়াত ২৮)

www.pathagar.com

আদমের পূর্বের প্রজাতির মানুষের ইতিহাস

আদম (আ) ও বিবি হাওয়া পৃথিবীর আদি খেলাফতধারী মানব-মানবী। তাঁদের আগে পৃথিবীতে মানব প্রজাতির নিম্ন ধাপের মানুষের অস্তিত্ব ছিল কি? আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রকৃতি থেকে আহরিত তথ্য ও বাস্তবতার নিরিখে বলা যায় মানব জাতির পূর্ণতা ও তাদের দৈহিক পরিগঠন স্রষ্টার সুদীর্ঘ সাংগঠনিক পরিকল্পনার অধীনে, সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে, বিভিন্ন পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিবর্তনের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে। বিজ্ঞানীদের অদম্য চেষ্টায় আদমের আগেও মানুষের কোন প্রজাতি ছিল কিনা এ ব্যাপারে গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানের যে শাখায় এ ব্যাপারে গবেষণা হয় তার নাম নৃ-বিজ্ঞান বা জীবাশ্ম বিজ্ঞান। এ শাখায় গবেষণাকারীদের নাম নৃ-বিজ্ঞানী। তাদের গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে মানুষের আদি উৎস সম্পর্কে অনেক আশ্চর্যজনক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এসব তথ্য আমাদেরকে সৃষ্টিশীল বিবর্তন সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলছে। আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি পৃথিবীর আদি একক প্রাণ সত্তার (অ্যামিবা) সাথে আমাদের দেহ কোষের সাদৃশ্য ও অন্যান্য প্রাণীর কোষের সম্পর্কের ব্যাপারটি। এটি সৃষ্টিশীল বিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আজকের আধুনিক মানুষের রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এক সুদীর্ঘ সময় থেকে। নৃ-বিজ্ঞানীগণ অতি প্রাচীন কালের মানুষের হাড়ের টুকরার (ফসিলের) অংশ বিশেষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ পেয়েছেন যে এখন থেকে প্রায় ৬/৭ কোটি বছর আগেও মানুষের চেয়ে ছোট ও কম বুদ্ধিমান এক ধরনের মানুষ পৃথিবীতে ছিল। এরা ছিল বানরের চেয়ে বড় ও বেশী বুদ্ধিমান। এদেরকে প্রাইমেট নামে আখ্যায়িত করা হয়। নৃ-বিজ্ঞানীদের চেষ্টা এখানে এসেই থেমে যায়নি। তারা এক এক করে অনুসন্ধান চালিয়ে আরও যে সব মানুষের ফসিল আবিষ্কার করেন, তাদের নাম দেয়া হয় পিকিং মানব, জাভা মানব, হোমো-হ্যাবিলাস এবং হোমো ইরেকটাস। অত:পর ৪০ থেকে ৫০ হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ের যে

www.pathagar.com

সব মানুষের ফসিল পাওয়া গেছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে হোমো-স্যাপিয়ানস। এরা বর্তমান প্রজাতির মানুষের একেবারে কাছাকাছি প্রজাতির মানুষ। এ হোমো-স্যাপিয়ানস মানুষের উৎপত্তি ঘটেছে প্রাইমেট প্রজাতির মানুষ থেকেই।

পবিত্র কোরআনে মানুষের বিভিন্ন স্তর

অষ্টালপিনথিসিস (লুসি)
৪৫ লক্ষ বছর আগে
সূরা নূহ, আয়াত : ১৪

↓

হোমো ইরেকটাস
সূরা ত্বীন, আয়াত : ৪

↓

পিকিং ম্যান | হাইডেলবার্গ ম্যান | জাভা ম্যান | রোডেশিয়ান ম্যান

↓

নিয়ানডারথাল ম্যান
সূরা বাকারা, আয়াত : ৩০

↓

ক্রো-ম্যাগনন ম্যান
সূরা দাহর/ইনসান, আয়াত : ২৮

↓

আধুনিক মানুষ
সূরা আনআম, আয়াত : ১৩৩

ফসিল গবেষণায় নৃ-বিজ্ঞানীগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে, মানব প্রজাতির মধ্যে সুদীর্ঘ রূপান্তর প্রক্রিয়া ঘটেছে। মানব প্রজাতির রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে এদের মস্তিষ্কের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন ছিল লক্ষণীয়। এতে দেখা গেছে মস্তিষ্কের আয়তন বিভিন্ন পর্যায়ে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি হয়েছে। যেমন

www.pathagar.com

পর্যায়ক্রমে ৫০০ সিসি থেকে ৬০০ সিসি, ৭৫০ সিসি, ৮০০ সিসি, ৯০০ সিসি এবং ১২০০ সিসিতে উন্নিত হয়। এদের মধ্যে হোমো-স্যাপিয়ানস মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১২০০ সিসি। অপরদিকে বর্তমান আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১২০০ সিসি থেকে ১৬০০ সিসি পর্যন্ত হয়। নৃ-বিজ্ঞানীগণ মনে করছেন হোমো-স্যাপিয়ানস মানুষের জেনেটিক রূপান্তরের মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্কের আকার পরিবর্তন হয়ে আধুনিক মানব প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। সে হিসেবে হোমো-স্যাপিয়ানস প্রজাতির মানুষের অধস্তন অন্যান্য প্রজাতিগুলোর ক্ষেত্রেও একই ভাবে জিন রূপান্তর কাজ করেছে। তাই এদের ক্ষেত্রেও মস্তিষ্কের আয়তনের পর্যায়ক্রমে উন্নতি ঘটেছে।

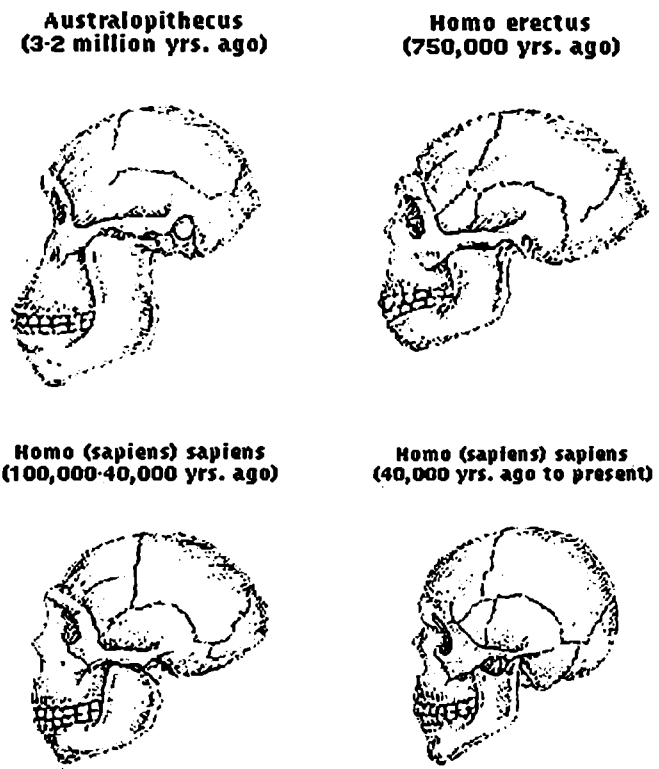

www.pathagar.com

হোমো-স্যাপিয়ানস মানুষের ইতিহাস হলো-এরা দলবদ্ধভাবে জীবন যাপন করত। তারা পাহাড়ের গুহায় বড় বড় গাছের আশ্রয়ে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠিভুক্ত হয়ে যাযাবরের মতো বসবাস করত। এদের মাঝেও নিজ পরিবারের সদস্য যেমন মাতা-পিতা এবং সন্তান সন্ততিদের প্রতি প্রেম–ভালবাসা ছিল এবং এদের মাঝে মানব সুলভ গুণ থাকলেও তারা অন্য গোত্রের সদস্যদের হত্যা করে তাদের হাড় মাংস পশুর মত ভক্ষণ করত। তাদের ছিল না ভাষা জ্ঞান এবং ছিলনা ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা। তারা পরস্পরের সাথে অশান্তি ও রক্তারক্তিতে মেতে থাকত। যখনি তারা এমন করেছে, তখনই ফেরেশতাগণ তাদের ধর-পাকড় করেছে। সম্ভবত এভাবে অথবা জেনেটিক বিলুপ্তির মাধ্যমে তাদের প্রজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

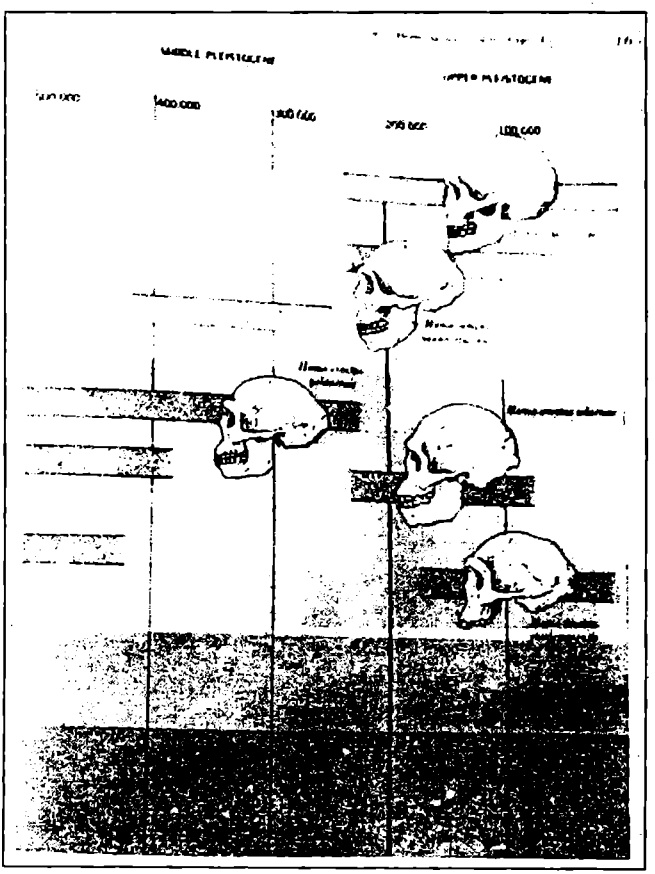

www.pathagar.com

আদিম যুগের মানুষের মস্তিষ্কের আকার পরিবর্তনের কারণ কি? এটা অবশ্যই জিজ্ঞাসার বিষয়। এর উত্তরে বলা যায় মস্তিষ্কের আকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জেনেটিক রূপান্তর মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও এর সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের বুদ্ধি শক্তি জড়িত ছিল। কারণ আদিম মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত না বিধায় তারা পশুর গোশত কাঁচা চিবিয়ে ভক্ষণ করত। এর ফলে তাদের চোয়াল ছিল বড় এবং মাথা ছিল ছোট। মাথা ছোট থাকায় মস্তিষ্কের আয়তন ছিল ছোট। ফলে তাদের বুদ্ধি শক্তিও ছিল কম। যখন তারা আগুনের ব্যবহার শিখল তখন থেকে তারা পশুর গোশত আগুনে সিদ্ধ করে খেতে লাগল। এর ফলে তারা আগের চেয়ে বেশী প্রোটিন হজম করতে পারল। কারণ কাঁচা গোশত চিবিয়ে খাওয়াতে তাদের আহার করা গোশত বেশী হজম হতো না। এর ফলে প্রোটিনের অভাবে তাদের বুদ্ধি শক্তিও ছিল কম। আগুনের ব্যবহার শেখায় তাদের জীবনযাত্রা পাল্টে যায়। তারা রান্না করে খেতে শেখে। এতে চোয়ালের উপর অতিরিক্ত চাপ কমে যায়। ফলে ধীরে ধীরে চোয়াল ছোট হতে থাকে এবং মাথা বড় হয়। এভাবে দিনে দিনে মস্তিষ্কের কুটুরী বড় হতে থাকে। ফলে মগজ ধরার জাগা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের বুদ্ধিশক্তিও বৃদ্ধি হতে থাকে। সাথে সাথে আদিম কাঠামোর মানুষের ধাপে ধাপে বিলুপ্তিও ঘটতে থাকে।

[হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের বন্য ও বর্বর মানুষের মাথার খুলি।]

www.pathagar.com

মানব প্রজাতির বিভিন্ন ধাপের মধ্যে অনেকেই ধারণা করেন এখনও প্রস্তর যুগের মানুষের অস্তিত্ব টিকে আছে। তাদের ধারণা মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলিয়া ও ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলে 'আলমা' নামের এক ধরনের প্রস্তর যুগের মানুষ রয়েছে। 'আলমা' এদের স্থানীয় ডাকনাম। আমাদের মত আধুনিক মানুষ 'আলমা' এক মেয়ের সাথে ঘর সংসার করেছে এমন প্রমাণও পাওয়া যায়।

১৮৬০ সালে রুশ ককেশাস অঞ্চলের জর্দান পার্বত্য এলাকার স্থানীয় এক শিকারীর হাতে কৃষ্ণগাত্রবর্ণ বাদামীচুল উচুকণ্ঠাহাড় ও উঁচু চোয়াল বিশিষ্ট এক মেয়ে 'আলমা' ধরা পড়ে। এই মেয়ে 'আলমা' পরবর্তী জীবন ঐ গ্রামেই কাটায়। সে কথা বলতে শেখেনি কিন্তু মানুষের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই জীবনযাপন করেছে। তার গর্ভে ৫টি সন্তানও হয়। কিন্তু সন্তানগুলো কথা বলতে পারে। (তথ্য দৈনিক সংগ্রাম; ৯ই এপ্রিল ১৯৯৭)

১৮৮৯'র দশকের কোন এক সময় ঐ 'আলমা' মেয়েটি মারা যায়। এসব তথ্যের সূত্র থেকে অনেকেই মনে করেন যে, এ ধরনের আলমা গোত্রের মানুষ এখনও ঐ এলাকায় গভীর অরণ্যে টিকে আছে।

আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় এখনও কিছু মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা উলঙ্গ হয়ে যাযাবরের মতো গহীন অরণ্যে বসবাস করে। এরা নিজেদের বৃদ্ধ পুর্বপুরুষদের হত্যা করে তাদের গোশত পর্যন্ত ভক্ষণ করে। এরা অসভ্য প্রকৃতির মানুষ হলেও এদের গঠন আকৃতি সভ্য মানুষের মতোই। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে আদমের আগেও যে মানুষের ন্যায় অনেক প্রজাতি ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায়। নৃ-বিজ্ঞানীগণ মাটির নীচের চাপা পড়া অতি প্রাচীনকালের মানুষের হাড়ের টুকরার উপর গবেষণা চালিয়ে আদমের আগের বিভিন্ন ধাপের মানুষের ন্যায় জীবের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন।

আদমের আগের মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা) ছিলনা। তারা পশু শ্রেণীর মানুষ। এদের শরীরের বাড়তি লোম দ্বারা তাদের লজ্জা স্থান ঢেকে রাখত। আর শীত নিবারণের জন্য ব্যবহার করত পশুর চামড়া ও গাছের ছাল। তারা একদল অন্য দলের সাথে রক্তারক্তি করত। উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করতে তাদের কোন সংকোচবোধ ছিলনা। আজকের আধুনিক

www.pathagar.com

মানুষ সেই পশু শ্রেণীর মানুষ থেকে উদ্ভব হয়েছে বিধায় তারাও পরস্পরের সাথে রক্তারক্তি করে। কিছু কিছু মানুষের মাঝে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার প্রবণতা উঠে যাচ্ছে। বর্তমান মানুষের এ ধরনের আচরণ পূর্ববর্তী মানুষের জেনেটিক সূত্র থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

Ape (লেজবিহীন বানর)

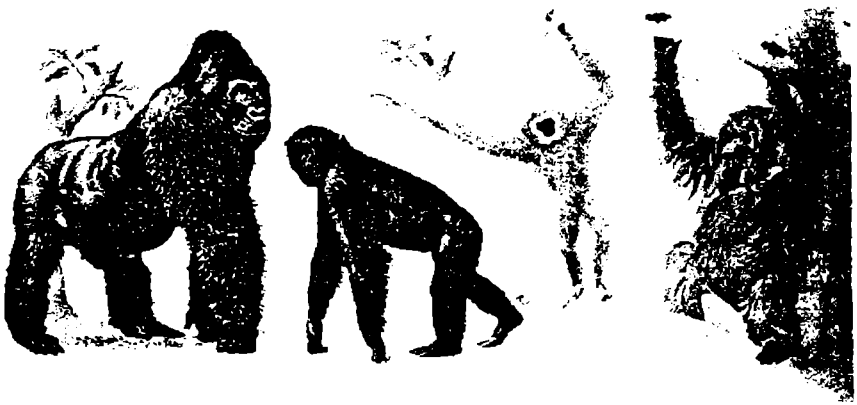

লেজ বিহীন বানর দেখতে অনেকটা মানুষের মতো। স্রষ্টার উদ্দেশ্য মুখী বিবর্তনের এরা জ্বলন্ত সাক্ষী।

(ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগের কাল্পনিক মানুষ

(খ) নব্য প্রস্তর যুগের কাল্পনিক মানুষ।

www.pathagar.com

আধুনিক বিবর্তনবাদ

পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ দিনে দিনে পাল্টে যাচ্ছে। যেখানে একদিন নদী, নালা, বিল ছিল, সেখানে এখন গড়ে উঠেছে জনপদ, দালান কোঠা ইত্যাদি। এটা প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের ছোঁয়া উদ্ভিদ জগতে যেমন পড়েছে তেমনি জীব জগতেও লেগেছে। এ হিসেবে পৃথিবীতে যখন মানুষ প্রজাতির আবির্ভাব হয় তখন থেকেই তারা বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়নি। মানব জাতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপ পার হয়েছে। তারমধ্যে বন্য ও বর্বর মানুষেরা পাথরের তৈরী হাতিয়ার দিয়ে তাদের কলা কৌশলের যাত্রা শুরু করে। সে যুগটা ছিল প্রস্তর যুগ। এ প্রস্তর যুগকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন প্রাচীন প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ। শেষ পর্যন্ত নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ থেকে সভ্য মানুষের আবির্ভাব ঘটে। মানব প্রজাতির এই যে বিবর্তন, এটার পদ্ধতি কি ছিল? বিজ্ঞানীগণ মনে করেন প্রত্যেকটি প্রাণী ও উদ্ভিদ তার পূর্ববর্তী নিম্ন শ্রেণীর জীব বা উদ্ভিদ থেকে ক্রমবিকাশের (ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে) মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে। এ ধারণাটা সঠিক হলেও ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাই বিবর্তন সম্পর্কে নতুন ভাবে চিন্তা করা শুরু হয়েছে, এটাই আধুনিক বিবর্তনবাদ। বর্তমানে আধুনিক বিবর্তনবাদকে জীবনের সাংগঠনিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথবা একে সৃষ্টিশীল বিবর্তনবাদও বলা চলে। এ পদ্ধতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিকল্পনার কথা স্বীকার করা হয়। যা একজন মহাপরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনা অনুসারে সংগঠিত হয়েছে।

আধুনিক যুগের মানুষ ক্রস-ব্রিডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে উন্নততর জাতের পশু পাখির উদ্ভব ঘটাচ্ছে। এ হিসেবে মানব প্রজাতির বিকাশের ক্ষেত্রে কি প্রাকৃতিক ক্রস-ব্রিডিং পদ্ধতি বিরাজমান ছিল? সেটা কি স্বত:স্ফূর্ত, নাকি কারও পরিকল্পনাধীন ঘটেছে?

www.pathagar.com

যারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনা তারা মনে করে প্রাকৃতিক ক্রস-ব্রিডিং পদ্ধতি স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু যারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাদের ধারণা প্রাকৃতিক ক্রস-ব্রিডিং পদ্ধতি স্রষ্টার সার্বিক তত্ত্বাবধানে সংগঠিত হয়েছে। যখন বন্য ও বর্বর মানুষ-প্রজাতির বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে তখনি প্রকৃতি রাজ্যের সাংগঠনিক বিবর্তন ধারায় তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ ও জেনেটিক রূপান্তর ঘটেছে। এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে, মানুষের বংশানুক্রমিক প্রজনন ধারার মাঝে পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে। যখন রূপান্তর সংঘটিত হওয়ার মতো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখনি স্রষ্টার পরিকল্পনাতে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার তিন নম্বর পদ্ধতি অনুসারে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে। এভাবে জীব মানুষের (বন্য ও বর্বর) শেষ ধাপ হোমো-স্যাপিয়ানস মানুষে এসে টেকে। এ শ্রেণীর মানুষের মাঝে কিছুটা সভ্য স্বভাবের উদ্ভব ঘটেছিল। এরা আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। তারা খাদ্যদ্রব্য আগুনে সিদ্ধ করে খেত। এ ধরনের জীব মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার খেলাফতকারী মানুষ ছিল না। এদের থেকে কোন প্রকার পরিকল্পনা ছাড়াই আদমের আবির্ভাব ঘটেনি। বরং সৃষ্টিকর্তার কালজয়ী এক বিস্ময়কর ইতিহাসের ধারা ও জবাবদিহিতামূলক পরীক্ষার সূত্রপাতের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ব্যতিক্রমধর্মী রীতি প্রবর্তন করে আদমকে পয়দা করেছিলেন।

আল-কোরআন ও নৃ-বিজ্ঞানের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি পৃথিবীতে আদমের আগেও জীব মানুষ (বন্য ও বর্বর) ছিল। এ ধরনের মানুষ থেকেই আদমের আবির্ভাব। এখানে এসে প্রশ্ন দাঁড়ায় আদমের জন্ম যে জীব মানুষ থেকে হয়েছে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তার প্রমাণ কি? এর জবাবে বলা যায় ডি,এন,এ টেপ বা জিন প্রতিস্থাপনের কথা। বর্তমান যুগের মানুষ আদমের বংশধর। এদের স্বভাব ও দৈহিক গঠনে রয়েছে জীব মানুষের ডি. এন. এ. টেপ। যার জন্য এদেরকে শত ঐশী বাণী শোনানোর পরও তাদের স্বভাব প্রকৃতি বার বারই মূলের দিকে ধাবিত হয়।

খুব শক্ত ধরনের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই জীব মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে সুস্থ মানবিক (সভ্য) বিকাশের অনুকূলে আনা যায়। তাছাড়া আহার-নিদ্রা, পয়ঃনিষ্কাশন এবং প্রজনন রীতি ইত্যাদি সবই জীব মানুষের

www.pathagar.com

মতই চলে। কেউ যদি এ কথাটি মানতে রাজি না হন, তবে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে কেনইবা বার বার আদম জাতি পশুর স্তরে নেমে আসে? বর্তমান পৃথিবীর মানুষের মাঝে কি পশুর স্বভাব নেই? আমার মনে হয় এর কোন সদোত্তর পাওয়া যাবে না।

আধুনিক বিবর্তনবাদেরও ধারণা মানুষের সাংগঠনিক পরিকল্পনার ধারার প্রথম ধাপ শুরু হয় পানির এককোষী জীব থেকে এবং জীবের আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে স্রষ্টার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে। কিন্তু ডারউইন চিন্তা করেছিল জীবের আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে। যখন পানির জীব ডাঙ্গায় পড়ে খাবি খাচ্ছিল তখন তার হাত-পা গজিয়ে গিয়েছিল। এখানেই আধুনিক সৃষ্টিশীল বিবর্তনবাদের সাথে ডারউইনের বিবর্তনবাদের তফাৎ। বিবর্তনের মাধ্যমে যে জীব ও উদ্ভিদ জগতের বিকাশ ঘটেছে এটা একশত ভাগ সত্য। এমনটি না হলে মানুষ কোন হালাল জীব ও উদ্ভিদ খেয়ে হজম করতে পারত না। অপর দিকে মানুষ যদি পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের সাংগঠনিক পরিকল্পনার বাইরের কোন জীব হতো তাহলে পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদের সাথে তার কোষ-কলার কোন মিল থাকত না।

দর্শনের দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় তৃণলতা সহজে তৃণলতা, পশুরা সহজে পশু আর মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় মানুষ। এ ক্ষেত্রে মানুষ (সভ্য) যদি বন্য ও বর্বর মানুষ থেকে উদ্ভব না হতো তাহলে তার চেষ্টার কোন প্রয়োজন ছিল না। মানুষ হিসেবে আমাদের জানার কৌতুহল ব্যাপক। আমরা সব সময় চিন্তা করি তার আগে কে বা কি ছিল। আদম পৃথিবীর প্রথম সভ্য মানব। তিনি কখনো শূন্য থেকে পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি। কিংবা মাটির আদম কখনো আকাশ থেকে লাফিয়ে পৃথিবীতে পড়েননি। তিনি নিশ্চয়ই কোন জীব মানুষের উৎস থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। তবে পরম আত্মার আদম দুনিয়ার বাইরের কোন শান্তির উদ্যান থেকে নেমে এসে পৃথিবীর জীব আত্মার আদমের সাথে পরম বন্ধু হিসেবে একাকার হয়েছেন। তাই আদম জাতের রয়েছে জীব আত্মা ও পরম আত্মা। মূলত পরম আত্মার আদম জীব মানুষের দেহে প্রতি স্থাপন হওয়ার পর তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও স্রষ্টার আনুগত্য করার প্রবণতার বিকাশ ঘটে।

www.pathagar.com

জীব আত্মার মানুষের উৎপত্তি ঘটেছে হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের (বন্য ও বর্বর) মানুষ থেকে। তাই তার চরিত্রে রয়েছে জীব মানুষের (বন্য ও বর্বর) জেনেটিক তথ্য। পক্ষান্তরে পরম আত্মা বহন করে ঐশী গুণাবলী। এগুণ মানবতাবোধ ও সৃষ্টার অনুগত্যের তথ্য বহন করে। তবে জীব আত্মা ও পরম আত্মার মধ্যে কর্মক্ষেত্রে যেটি জয়ী হয় সেটির চরিত্রই প্রাধান্য পায়। এখানে এসে জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে, জীব আত্মা ও পরম আত্মার সমন্বয় হলো কিভাবে? এ প্রশ্নটি খুবই জটিল। কারণ যখন থেকে এ বংশানুক্রমিক রীতি প্রবর্তিত হয়, তখন যে ঘটনার মাধ্যমে রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সাধিত হয়েছিল, তার কোন আলামত এখন আর পৃথিবীতে নেই। সুতরাং যিনি এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি ঘটিয়েছেন, তাঁর বাণী অনুসরণ করেই আমাদেরকে এর মূল রহস্য জানার চেষ্টা করতে হবে।

আধুনিক সভ্য মানুষের উদ্ভব যে জীব মানুষের (বন্য ও বর্বর) উৎস থেকে হয়েছে তার একটি উদাহরণ এখানে আনা হলো; যেমন হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের মানুষসহ তার পূর্ব প্রজাতির মানুষগুলো উলঙ্গ থাকত বলে তাদের লজ্জাস্থান আবৃত রাখার জন্য তাদের যৌনাঙ্গের চারদিকে ছিল বিশেষ ধরনের চুল। এ চুলগুলোর প্রধান কাজ হলো যৌনাঙ্গ ঢেকে রাখা। এগুলোর আরও কোন কাজ ছিল বলে প্রমাণ মেলে না। এখনও যেহেতু আমাদের বংশধরের মাঝে ঐ শ্রেণীর মানুষের ডি.এন.এ জিন রয়েছে, তাই আমাদের লজ্জাস্থানের চারদিকে এখনও সে ধরনের চুল গজায়। জীব আত্মার আদম যে হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের বংশগতির তথ্য বহন করছে এটিও একটি বড় দৃষ্টান্ত। আধুনিক বিবর্তনবাদ জীবের আঙ্গিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জেনেটিক রূপান্তর-এর বিষয়টিই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।

www.pathagar.com

আল কোরআনে বন্য মানুষের বিলুপ্তির ইতিহাস

আদম (আ) ও বিবি হাওয়া পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী। তাঁদের আগে পৃথিবীতে আর কেউ খেলাফত নিয়ে আসেননি। আল্লাহ যখন আদমকে ফেলাফত দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তখন ফেরেশতাগণকে আদমের আনুগত্য করার জন্য ডেকে জানিয়ে দিলেন।

"আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আমি পয়দা করব দুনিয়ার মধ্যে একজন প্রতিনিধি। ফেরেশতারা বলল, আপনি কি পয়দা করবেন এমন লোক যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে।" (সূরা বাকারা : ৩০)

ফেরেশতাগণ পূর্ব অভিজ্ঞতার বাইরে কোন উত্তর দিতে পারে না। প্রতিনিধি হিসেবে আদমকে দুনিয়ায় পাঠানোর আগে সেখানে হয়ত এমন এক জাতি বাস করত যারা অশান্তি ও রক্তপাত ঘটিয়ে ছিল। ফলে ফেরেশতাগণ পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আল্লাহর প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানানোর সময় নিজেরা জানার জন্য পূর্বতন মানুষের কার্যকলাপ তুলে ধরেন। সে হিসেবে আমরা মানুষ জাতিকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন, বন্য ও বর্বর মানুষ বা পশু শ্রেণীর মানুষ এবং খেলাফতধারী মানুষ। একই গঠনের দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তফাৎ ছিল খুবই নগণ্য। এ ক্ষেত্রে উভয়ের মস্তিষ্কের আয়তনের মাঝে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। এটা ছিল দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে পার্থক্য। অপর দিকে বন্য মানুষেরা খেলাফতধারী ছিল না। তাই তাদের জবাবদিহীতা ও কর্মের স্বাধীনতা ছিল না এবং তাদের ছিল না ভাষাজ্ঞান। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম করার অধিকার পায়নি। কিন্তু খেলাফতধারী মানুষের ছিল ভাষাজ্ঞান এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম করার অধিকার। এ কারণে তাদের কর্মের জবাবদিহিতা ছিল।

বন্য মানুষরা কখনো স্রষ্টার আনুগত্যের বিরোধিতা করতে পারত না। এ অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়নি। ফলে যখনি তারা স্রষ্টার আনুগত্যের বিরোধীতা করেছে তখনি ফেরেশতাগণ তাদের কর্মে বাধা দিয়েছেন। তাদেরকে শাস্তির জন্য সাথে সাথে ধরপাকড় করে আযাব-গজব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। কারণ বন্য মানুষের সকল কাজের আনুগত্য করার

www.pathagar.com

অধিকার ফেরেশতাগণকে আল্লাহ দেয়নি। এবার যাকে ফেলাফত দিয়ে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠাতে চাচ্ছেন তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো তার সকল কাজের আনুগত্য করার অধিকার ফেরেশতাদেরকে দিয়ে দেয়া। খেলাফতধারী মানুষের ভাল-মন্দ কোন কাজেই ফেরেশতাগণ যেন পূর্বের ন্যায় বাধা না দেয়, সেজন্য প্রতিনিধি পাঠানোর আগেই তার আনুগত্য করার জন্য ডেকে অবহিত করলেন। আল্লাহ আদমকে পয়দা করে ফেরেশতাগণের সামনে আদমের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তাকে সেজদাহ করতে বললেন। আমরা নামাজে যেভাবে সেজদাহ করি মূলত ফেরেশতাদের সেজদাহ এমন কিছু নয়। এ সেজদাহ হলো আদমের সকল কাজের (ভাল/মন্দ) আনুগত্য করা।

আল্লাহ বলেন-

"আর আল্লাহ আদমকে (সৃষ্টি করে) শিখালেন যাবতীয় বস্তুর নাম (বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ)। এরপর উহাদেরকে (বস্তুসমূহকে) ফেরেশতাদের সামনে রেখে বললেন, তোমরা আমাকে বল এ সমস্ত বস্তুর নাম (বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কোন বস্তু কোন কাজে লাগে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ফেরেশতারা বলল, আপনি মহান পবিত্র আমাদের জ্ঞান নাই কেবল উহা ব্যতীত-যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী হেকমত ওয়ালা)।" (সূরা বাকারা : ৩২)

"আমিই তোমাদের বানিয়েছি; আমিই তোমাদেরকে দিয়েছি গঠনাকৃতি। তারপর আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছি সিজদা কর আদমকে।" (সূরা আ'রাফ আয়াত-১১)

বন্য (পশু শ্রেণীর) মানুষের কর্মের স্বাধীনতা না থাকায় তাদেরকে ফেরেশতাগণ সেজদা বা আনুগত্য করেনি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সেজদাহ করতে বলাও হয়নি। বন্য মানুষের চেয়ে খেলাফতধারী মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ গুণ বেশী ছিল। যার জন্য ফেরেশতাগণ বাধ্য হয়েছিল আদমের আনুগত্য বা সেজদা করতে। সে গুণটি হলো ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা। কিন্তু বন্য মানুষের এ গুণটি ছিল না বলে দুনিয়ায় অশান্তি ও রক্তারক্তি করে টিকে থাকতে পারেনি। কিন্তু খেলাফতধারী মানুষ একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য মারামারি-কাটাকাটি, চুরি-ডাকাতি সহ শত রকমের

www.pathagar.com

অপরাধ করেও দুনিয়ায় টিকে আছে। অথচ বন্য ও বর্বর মানুষেরা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুনিয়া থেকে যে এ ধরনের মানুষের বিলুপ্তি ঘটেছে তা আল-কোরআনেই উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ বলেন-

"নিশ্চয় আমরা এদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের সবাইকে করেছি শক্তি সম্পন্ন (বা তাদের গঠনকে মজবুত করেছি); এবং যখন আমরা ইচ্ছা করেছি তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিয়ে (অথবা বদলিয়ে দিয়ে) তদস্থলে অনুরূপ ধরনের মানুষকে করেছি স্থলাভিষিক্ত। (সূরা দাহর আয়াত-২৮)

"তিনি (আল্লাহ) চাইলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং তিনি যাদেরকে চাইবেন উত্তরাধিকারী হিসেবে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন ঠিক সেভাবে যেভাবে অন্য সম্প্রদায়ের বংশধর হতে তোমাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন।" (সূরা আনআম : ১৩৩)

আল কোরআনের উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আদমের আগেও পৃথিবীতে পশু (বন্য) শ্রেণীর মানুষ ছিল। সভ্য মানুষ সৃষ্টির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে তার আগে আরও অনেক ধাপ বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে নৃ-বিজ্ঞানীগণ মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সেসব মানুষের ফসিল আবিষ্কার করছেন। মানব প্রজাতির বিকাশের ক্ষেত্রে স্রষ্টার সাংগঠনিক পরিকল্পনার বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে। সৃষ্টির বিকাশ দৈবক্রমে তাড়াহুড়া করে ঘটেনি। এটি ঘটেছে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে। নিম্নের আয়াতে আল্লাহর সে ক্রমবিকাশ নীতির কথা উল্লেখ রয়েছে।

"(আল্লাহ) গঠন করেছেন তোমাদেরকে উন্নতির নানা মাত্রায় (পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে)। (সূরা নূহ : ১৪)

আদমের আগেও যে বন্য ও বর্বর শ্রেণীর মানুষ ছিল সেটার বড় প্রমাণ আমরা নিজেরাই। আমাদের মাঝে রয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য 'জিন'। যা পূর্বতন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বহন করে নিয়ে আসে। আমাদের মাঝে এমন লোক আছে যারা বন্য ও বর্বর শ্রেণীর মানুষের মতো অশান্তি ও রক্তারক্তি করে। আমাদের পূর্ব পুরুষ (আদি পিতা-মাতা) যদি বন্য মানুষের সূত্র ধরে দুনিয়ায় না আসত তা হলে আমাদের মাঝে কোন অবস্থাতে পশুর স্বভাব থাকত না।

www.pathagar.com

আদম হাওয়ার জন্ম রহস্য

আমরা যদি ক্রমান্বয়ে অতীতের দিকে ফিরে যেতে থাকি তখন দেখব মানুষের আদি উৎস আদি এককে (Singularity) গিয়ে ঠেকে। অপর দিকে মহা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক এক করে অতীতের দিকে ফিরে গেলে বিশ্বের আরম্ভ একটি সংকোচিত বিন্দুতে এসে থেমে যায়। এরপরও যদি কিছু কল্পনা করার থাকে তখন হয়ত মিলবে শূন্যের অস্তিত্ব। মহাবিশ্ব যেমন আদি এক একক থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে অগণিত সৃষ্টিতে ভরে গেছে, তেমনি জীবজগৎ আদি এক একক থেকে সৃষ্টিশীল বিবর্তন ধারায় সম্প্রসারিত হয়ে অসংখ্য বন্য পশু-পাখি, উদ্ভিদ ও বন্য মানুষ সহ সভ্য মানুষের আবির্ভাব ঘটে। এক্ষেত্রে জগৎ-মহাজগতে আদমের আবির্ভাব তিনটি ধাপে এসে পূর্ণতা লাভ করে। সে ধাপগুলো মহা পরিকল্পনাকারীর সৃষ্টিশীল সাংগঠনিক বিবর্তনের মাধ্যমে মাটির পৃথিবীতে এসে পূর্ণতায় পৌঁছে। আদমের আবির্ভাবের প্রথম ধাপ শুরু হয় আত্মিক পর্যায়ে। সে সময় জগৎ-মহাজগতে ধ্বনাত্মাক সত্তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর Positive information bit বা "ধ্বনাত্মক তথ্য কণা" হিসেবে আদমের (আত্মিক পর্যায়ে) আবির্ভাব ঘটে। তারপর ঐ সত্তা থেকে উৎপত্তি হয় তার সঙ্গীনী Negative information bit বা "ঋণাত্মক তথ্যকণা" ও বজ্য তথ্যকণার (কৃষ্ণকায়া তরঙ্গ)।

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি অভিন্ন প্রাণ কিংবা একক জীবকোষ থেকে এবং ইহা হতেই সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া।" (আল-কোরআন)

আত্মিক পর্যায়ে আদম (ধ্বনাত্মক সত্তা) ও হাওয়া (ঋণাত্মক সত্তা) এবং বর্জ্যকণা (শয়তান) সৃষ্টির পর তাদের উৎস থেকে সৃষ্টিশীল বিবর্তন ধারায় পয়দা হয় ভাল মন্দ সকল আত্মা। মূলত পরোক্ষভাবে আদমের উৎস থেকে সকল বস্তু কণা ও প্রাণ সত্তার উৎপত্তি ঘটে। তাই সকল বস্তু, উদ্ভিদ ও জীবদেহে রয়েছে তথ্যকণার সমাহার। বস্তু বা জীবদেহ থেকে যেমন

www.pathagar.com

আলোক উজ্জ্বল শক্তি ও কৃষ্ণকায়া শক্তি বিকিরণ হয় তেমনি আদমের অস্তিত্ব থেকে খোদার নির্দেশে ভাল-মন্দ দু'রকমের সত্তার উৎপত্তি ঘটে।

"আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে পয়দা করলেন, তাঁকে পয়দা করে তাঁর ডান কাঁধে করাঘাত করলেন, তারপর তার সন্তানদেরকে বাহির করলেন, উহারা এরূপ শুভ্র যেন মুক্তার মত উজ্জ্বল দুগ্ধ। তৎপর তিনি তাঁর বাম কাঁধে করাঘাত করলেন এবং কৃষ্ণকায়া সন্তান বের করলেন, যেন তারা কাল কয়লা। তৎপর তিনি তার ডান হাতের সন্তানদের সম্বন্ধে বললেন, ইহারা জান্নাতবাসী হবে আর ইহাতে কোন পরওয়া নাই। আর তার বাম হাতের তালুস্থিত সন্তানদের সম্বন্ধে বললেন, ইহারা জাহান্নামে যাবে। আর এই ব্যাপারে কোন পরওয়া নাই।" (হাদীসে কুদসী)

"সৃষ্টির আদি এক একক সত্তা (আদমের) উৎস থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বস্তুকণা এবং বস্তু জগতের সকল গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ও ছায়াপথ ইত্যাদির উৎপত্তির পর পৃথিবীর লোনা পানিতে উদ্ভব হয় অভিন্ন প্রাণ সত্তার ন্যায় একটি জীবকোষ। এটাই পৃথিবীর আদি এককোষী প্রাণী। এ ধরনের অভিন্ন প্রাণ সত্তাকে জীবআত্মার আদি উৎস হিসেবেই মনে করতে হবে। এখানেও কোষ বিভাজনের মাধ্যমে আদি এককোষী প্রাণী থেকে তার সঙ্গীনীর উদ্ভব ঘটে। অতঃপর তাদের থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল বহুকোষী জীবের উৎপত্তি হয়। এমনকি পৃথিবীর আদি এককোষী প্রাণী বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে জীব মানুষে উন্নিত হয়।

"আমি প্রতিটি জীবন্ত সত্তাকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা ২১ : আয়াত ৩০)

"তিনি আল্লাহ যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে।" (সূরা ২৫ : আয়াত ৫৪)

জীব মানুষের চূড়ান্ত ধাপ উন্নয়নের শিকড়ে পৌঁছতে তার আগেও অনেক নিম্ন শ্রেণীর মানুষ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে পরম আত্মার আদমকে পাঠানোর আগে তার জড়দেহ সৃষ্টির প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে ফেরেশতাদেরকে অবহিত করলেন। পৃথিবীতে তখন জীব মানুষের (বন্য মানুষের) চূড়ান্ত ধাপ হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের মানুষই বসবাস করত। এদেরকে সরিয়ে দিয়ে এক ব্যতিক্রমধর্মী পন্থায় আদম ও হাওয়াকে

www.pathagar.com

জীব আত্মা ও পরম আত্মায় পূর্ণতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। এ সময় আদমের সন্তানদেরকে আবার তার মাঝে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

এ সম্পর্কে আল-কোরআন ও হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ রয়েছে-

"তিনি (আল্লাহ) চাইলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং তিনি যাদেরকে চাইবেন, উত্তরাধিকারী হিসাবে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। ঠিক যেভাবে অন্য মানুষের বংশধর হতে তোমাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন।" (সূরা আনআম : আয়াত ১৩৩)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যে দিন আদমকে সৃষ্টি করলেন, সেদিন তিনি তার পিঠ থেকে এক মুষ্টি গ্রহণ করলেন। সমস্ত ভাল (পবিত্র) তাঁর ডান হাতে পড়ল এবং সমস্ত মন্দ (অপবিত্র) তাঁর অপর হাতে পড়ল। তখন তিনি বললেন, ইহারা ডান হাতের অধিকারী আর আমি ইহার বিপরীত করব না। আর ইহারা বাম হাতের অধিকারী আর আমি ইহার বিপরীত করব না। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আদমের পিঠে ফিরিয়ে দিলেন। আর সে অনুসারেই আজ পর্যন্ত তার বংশানুক্রমে সৃষ্টি চলছে।" (হাদীসে কুদসী)

আদমের জীবদেহ তৈরী ও পরম আত্মার মহা মিলন এবং দুনিয়ায় আবির্ভাব নিয়ে ধর্মীয় পরিসরে যেমন রয়েছে রূপকথার কাহিনী তেমনি রয়েছে প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের বৈজ্ঞানিক তথ্য। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম ও বিজ্ঞানে ব্যাপক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এতে আদমের জন্ম রহস্য বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর কারণ হলো কোরআন, হাদীসে এ বিষয়টির খুব সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা থাকায় অনেকেই তার সঠিক তথ্য অনুধাবণ করতে পারেনি।

বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষের দেহ কাঠামো তৈরী হয় মাতৃগর্ভে আর রূহ বা পরম আত্মা আসে রূহানী জগৎ থেকে। পিতা-মাতার মিলনে মাতার ডিম্বাণূ পিতার শুক্রকীটের মাধ্যমে নিষিক্ত হয়ে সেটি যখন মাতার জরায়ুতে প্রতিস্থাপিত হয়, তখন সেখানে পর্যায়ক্রমে সন্তানের আকৃতি গঠন হতে থাকে। এখানে পিতা মাতার ডি. এন. এ. কোড যে তথ্য নিয়ে আসে সেভাবেই সন্তান গঠিত হয়। এটা হলো যৌন মিলনের মাধ্যমে প্রজনন পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে মাতা-পিতা উভয়ের প্রয়োজন হয়।

www.pathagar.com

সৃষ্টির সূচনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় পিতা-মাতা ছাড়া সাগরের লোনা পানিতে পৃথিবীর আদি এককোষী জীব অ্যামিবার জন্ম হয়। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা কারও প্রয়োজন পড়েনি। এখানে পানি আর পানিতে মিশ্রিত উপাদানের মাধ্যমে একক প্রাণসত্তা গঠিত হলেও সেটিতে ডি. এন. এ. এর অতিক্ষুদ্র কণা 'জিন' যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করে তার কোন উৎস পানিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটির তথ্য পৃথিবীর বাইরের থেকে সৃষ্টির মহাপরিকল্পনাকারী যে প্রেরণ করেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। এই এককোষী প্রাণীটি কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একটা ভিন্ন অবস্থার দ্বৈত রূপ লাভ করে। এখান থেকেই প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। তাই মানুষ তথা আদমের (জীবদেহ) উৎস এখান থেকে।

"আল্লাহ সমস্ত প্রকারের প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে।" (সূরা নূর : ৪৫)

অতঃপর সন্তান জন্ম হওয়ার তিন নম্বর রীতিটি হলো পিতা ছাড়া শুধু মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান হওয়া। এক্ষেত্রে যৌন মিলনের প্রয়োজন হয় না। হযরত ঈসা (আ) বিবি মরিয়মের গর্ভ থেকে পিতার সংস্পর্শ ছাড়াই জন্ম হয়েছিলেন। এই তিন নম্বর পদ্ধতিটিও সৃষ্টির সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় চালু ছিল। এর মধ্যে যৌন মিলনে সন্তান হওয়া স্বাভাবিক পদ্ধতি। এ ছাড়া অন্য দু'টি পদ্ধতি বিশেষ মুহূর্তে কার্যকরী ছিল। এ দু'টি পদ্ধতির ক্ষেত্রে মানুষের কোন ভূমিকা নেই। মূলত এ দু'টি পদ্ধতিতে সৃষ্টির বিকাশ ঘটানো মহাপরিকল্পনাকারীর বিশেষ কর্মপদ্ধতির অংশ বিশেষ। সৃষ্টির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে স্রষ্টার সাংগঠনিক প্রক্রিয়া চালু ছিল।

তা নিম্নের আয়াত থেকেই বুঝা যায়।

"আমরা (আল্লাহ) মানুষকে গঠন করেছি সর্বোত্তম সাংগঠনিক পরিকল্পনা অনুসারে। (সূরা তীন : আয়াত ৪)

"(আল্লাহ) সেই একক সত্তা যিনি মানুষকে পানি থেকে গঠন করেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন বংশধারা (পুরুষের মাধ্যমে) এবং আত্মীয়তার ধারা নারীদের মাধ্যমে। (সূরা ফোরকান : আয়াত ৫৪)

প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে পানি থেকে। সে হিসেবে মানুষ সৃষ্টির সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ পানি থেকেই শুরু হয়।

www.pathagar.com

আগেও বলেছি প্রাথমিক পর্যায়ে এক অভিন্ন একক প্রাণ সত্তা (জীবকোষ) থেকে তার জোড়া সৃষ্টি হয়। তারপর যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রূপান্তর প্রক্রিয়া। এখানে লক্ষণীয় যে, মহাবিশ্বের সকল কিছুর জোড়া সৃষ্টি হয় একক প্রাণ সত্তা থেকে। সেটা পানির একক প্রাণসত্তা (অনুজীব) ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি আদমের ক্ষেত্রেও। নিম্নের আয়াতটি এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

"(আল্লাহ) সেই একক সত্তা যিনি গঠন করেছেন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী। (সূরা ৪ : আয়াত ১)

পানি থেকে যেমন মানুষের সৃষ্টির কথা বলা আছে তেমনি অন্যত্র বলা হয়েছে মাটির কথা। পানি ও মাটি উভয়ের মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টির কথায় প্রতিয়মান হয় যে, মানুষ সৃষ্টির সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ শুরু হয় পানি থেকেই। তারপর মাটির ভুবনে এসে মাটির সার অংশের মাধ্যমেই মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করে। মাতৃগর্ভে সন্তান পূর্ণতা লাভ করে ২৮০ দিনে। এই দিনের মধ্যেই শুক্র ও ডিম্বাণুর যৌথ সত্তা (ভ্রূণ) ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। শুক্র ও ডিম্বাণু খুব সূক্ষ্ম জিনিস। এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। নারীর ডিম্বাণু যখন পুরুষের শুক্রের মাধ্যমে নিষিক্ত হয়ে জরায়ুতে প্রোথিত হয় তখন থেকেই তার বিকাশ শুরু হয়। অপর দিকে জীব মানুষের পূর্ণতা আসতে চলে যায় কোটি কোটি বছর। শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন সময়ের প্রয়োজন তেমনি সৃষ্টির পূর্ণতার জন্য প্রাণীর সাংগঠনিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সময় ও পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। তাই পানির এক কোষী জীব থেকে কাদা মাটির মানুষ সৃষ্টিতে কোটি কোটি বছর লেগেছে। মূলত পানির এককোষী জীব থেকে যে মানুষের উদ্ভব হয় সে মানুষ হলো আত্মার মানুষ বা বন্য মানুষ। এদের থেকেই বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আদম ও হাওয়ার উদ্ভব হয়।

আল্লাহ বলেন-

"যখন তোমার প্রভু প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি একটি মানুষ তৈরী করতে যাচ্ছি কাদা থেকে। নকশাকাটা নরম মাটি থেকে।

www.pathagar.com

অতঃপর যখন আমি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তার গঠন পুরাপুরি সমাপ্ত করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব। তখন তোমরা তার সামনে সিজদানত হয়ে যাবে।" (সূরা হিজর : আয়াত ২৮-২৯)

আল্লাহ মহাবিশ্বের পরম সত্তা। তিনি অবিনশ্বর, অনাদি, একক, মহাবিশ্বের পরম প্রতিপালক, বিশ্বের পরম আত্মা। স্রষ্টা জীব আত্মার আদমের গঠন (জীবদেহ) পরিপূর্ণ করে তাতে নিজের রূহ ফুঁকে দিলেন। এখানে "আমার (স্রষ্টার) রূহ" বলতে "পরম আত্মা" বুঝতে হবে যা অবিনশ্বর। স্রষ্টার নিজের রূহ ফুৎকার করে দিয়ে দেননি। বরং স্রষ্টা আদমের কলবে এমন এক আত্মা ফুঁকে দিলেন যা স্রষ্টার ন্যায় অবিনশ্বর ইচ্ছাশক্তির স্বাধীন, সম্পূর্ণ ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত।

আত্মা ফুঁকে দেয়ার দৃষ্টান্ত হলো রিমোট কন্ট্রোল টেলিভিশনের ন্যায়। জীব আত্মার আদমের দেহটি একটি টেলিভিশনের ন্যায় তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ করার মতো মাধ্যম। উল্লেখ্য টেলিভিশন কখনো নিজে থেকে কোন তথ্য দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কমপিউটারের জ্ঞান দেয়া হলে এটি নিজে থেকে উত্তর দিতে পারে। মানুষের পরম আত্মার গুণাগুণ অনেকটা তেমনি। রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটার টিলিভিশনের বা রোবোটের দিকে তাক করে একটা নির্দিষ্ট সুইচে চাপ দিলে সেটা থেকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিভ ওয়েভ বেরিয়ে আসলে সেটা টেলিভিশনের বা রোবোটের রিমোট কন্ট্রোল রিসিভার গ্রহণ করে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আত্মা ফুঁকে দেয়া অনেকটা এ রকম। আদমের জড়দেহটা হলো রিমোট কন্ট্রোলের রিসিভারের ন্যায়। স্রষ্টা (আত্মা মানে পরমাত্মা) রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে যেভাবে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিভ ওয়েভ প্রেরণ করা হয় তেমনি ভাবে পরমআত্মা প্রেরণ করেন বা ফুঁকে দেন। জীব মানুষের দেহে রয়েছে পানির আদি এককোষী জীবের ন্যায় অভিন্ন সত্তা। এগুলোকেই বলা হয় জীবকোষ। প্রতিটি জীব কোষের রয়েছে অভিন্ন প্রাণকেন্দ্র। এক কোষী জীবের বংশবৃদ্ধি হয় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে, তেমনি জীবকোষের বিকাশ ঘটে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

মানুষ বহুকোষী জীব। জীব মানুষের প্রজাতি পূর্ণতার শিখরে পৌছতে যতগুলো ধাপ পার হতে হয়েছে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পূর্ণতা বুঝাতে গিয়ে সবগুলো ধাপই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সূচনার বেলায় পানির নাম এসেছে এবং পূর্ণতার বেলায় মাটির উল্লেখের সাথে সাথে পরম আত্মা ফুঁকে দেয়ার কথা এসেছে। তারপর বংশগতির ধারা প্রবর্তন করতে গিয়ে যৌন মিলনের মাধ্যমে প্রজননের কথা এসেছে। এখানে বিশেষণযুক্ত সবেগে স্খলিত পানির (বীর্যের) মাধ্যমে বর্তমানে যে ভাবে বংশবৃদ্ধি হয় সেটার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

"মানুষ কি সেই সামান্যতম শুক্র ছিল না যা সজোরে নিক্ষিপ্ত, নির্গত হয়েছিল?" (সূরা ৭৫ : আয়াত ৩৭-৩৮)

এভাবে বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ের দরকার হয়। আদম ও বিবি হাওয়ার জড়দেহ তৈরী হতে সবেগে নির্গত পানি (বীর্য) লেগেছিল কি? যদি তাদের ক্ষেত্রে সবেগে নির্গত পানি (বীর্য) প্রয়োজন হতো তবে তাদেরও পিতার পরিচয় পাওয়া যেত। এক্ষেত্রে তাদেরকে পৃথিবীর আদি মানব মানবী বলা হতো না। সুতরাং সৃষ্টির সাংগঠনিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ ধারায় আদম এবং হাওয়ার সৃষ্টিতে সাধারণ পানির অবদান অবশ্যই আছে। কিন্তু তাদের জন্মের ক্ষেত্রে সবেগে নির্গত (বীর্য) পানি অবশ্যই লাগেনি। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, তাদের জড়দেহ তৈরী হলো কি প্রক্রিয়ায়? এ ব্যাপারে অতীতে যেসব রূপক গল্প চালু আছে সেই ভাবেই কি আদম, হাওয়ার জড়দেহ তৈরীর মূল প্রক্রিয়া? এর উত্তরে বলতে হয় রূপক গল্পগুলো পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া এর কোন কোরআন, হাদীসের ভিত্তি বা বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা নেই। তাহলে কি আদম, হাওয়ার জড়দেহ আকাশ থেকে রকেটের মাধ্যমে নামানো হয়েছিল? এর উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন কারণ, সহজ অর্থে "আদমের জন্ম রহস্য" তুলে ধরলে কেউ যেমন মানবে না তেমনি গবেষক ছাড়া কারও পক্ষে বুঝাও কঠিন।

আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি আদম, হাওয়ার জড়দেহ বিভিন্ন দেশের মাটি দিয়ে খামির বানিয়ে তৈরী করা হয়নি। সৃষ্টির সাংগঠনিক বিবর্তন ধারার একটা বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়। আদম ও হাওয়া

www.pathagar.com

মানুষ প্রজাতির চূড়ান্ত ধাপের প্রথম মানব-মানবী। তাদের আগে পৃথিবীতে খেলাফতধারী আর কোন মানব-মানবী ছিল না। তবে নিম্ন ধাপের বন্য ও বর্বর মানুষের প্রজাতি ছিল। যাদের প্রজাতি পৃথিবী থেকে আদম, হাওয়ার আবির্ভাবের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

মহাবিশ্বে আদম, হাওয়ার আবির্ভাব তিনটি ধাপে এসে পূর্ণতা পায়। প্রথমে তাদের আবির্ভাব ঘটে positive Information bit ও Negative Information bit হিসেবে। তারপর পানির একক প্রাণ সত্তা বা জীবকোষের মাধ্যমে জড় অস্তিত্বের সূচনা ঘটে। সেখান থেকেই বিবর্তিত হয়ে জীব মানুষে (বন্য) উন্নিত হলে এদের মাধ্যমেই তাদের আবির্ভাব ঘটে।

আদম ও হাওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্ণতাসহ পৃথিবীতে আবির্ভাবের ক্ষেত্রে জন্ম পদ্ধতির তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দু'টি বাদ দেয়া যায়। যেমন মাতা-পিতা ব্যতীত পয়দা হওয়া। এটি বাদ দেয়া যায় এই অর্থে যে, এভাবে শুধু এককোষী জীবই সৃষ্টি হয়েছে। তারপর পিতা-মাতার মিলনে পয়দা হওয়া বাদ দেয়া যায় এই অর্থে যে, আদম ও হাওয়ার ক্ষেত্রে যৌন মিলনে মাতৃগর্ভ থেকে পয়দা হওয়ার মতো কোন প্রমাণ দেয়া যাবে না। তবে তৃতীয় আর একটি পদ্ধতি আছে যে পদ্ধতির মাধ্যমে দুনিয়ায় মানুষ পয়দা হওয়ার মতো দৃষ্টান্ত রয়েছে। সে পদ্ধতিটি হলো পিতার সংস্পর্শ ছাড়াই মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান হওয়া। আদম ও হাওয়ার জন্ম পদ্ধতির ক্ষেত্রে উপরের দৃষ্টান্তটির কোরআন ও বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রমাণ তুলে ধরা সম্ভব। তবে এ তথ্যটি একেবারে নতুন ও গবেষণালব্ধ ধারণা। এর সাথে প্রচলিত ব্যাখ্যার কোন মিল নেই। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকের মনে ঝড় ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য নিরপেক্ষ মন নিয়ে জাহিলিয়াতকে ভুলে যেতে হবে। তবেই সত্যের সন্ধান মিলবে।

দুনিয়ায় হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম স্বাভাবিক প্রজনন পদ্ধতিতে হয়নি। তিনি বিবি-মরিয়মের গর্ভে পিতার সংস্পর্শ ছাড়াই পয়দা হয়েছিলেন। এ জন্য এই পদ্ধতিতে জন্ম হওয়ার ব্যবস্থাপনাটি আশ্চর্যজনক বলা চলে। এটি স্রষ্টার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিশেষ ব্যবস্থাপনা। অতীতে এভাবে জন্ম হওয়ার

www.pathagar.com

পদ্ধতিটি আশ্চর্য হলেও বর্তমানের জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং ও মানব ক্লোনিং-এর যুগে এটি মোটেও বিস্ময়ের বিষয় নয়। এখন মানুষের প্রযুক্তিতেই পিতার সংস্পর্শ ছাড়াই মাতৃগর্ভে (যৌন মিলন বহির্ভূত পন্থায় শুক্রকীট ছাড়াও) সন্তান জন্ম দেয়া সম্ভব প্রায়।

"সে বলেছিল (মরিয়ম). হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আমার পুত্র হবে? কোন মানুষ (পুরুষ) তো আমাকে স্পর্শ করে নাই! তিনি বললেন, এভাবেই; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কার্যের মনস্থ করেন তখন তিনি "হও" ব্যতীত বলেন না, ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৭)

ঈসা (আ)কে পুরুষ মানুষের স্পর্শ ছাড়াই আল্লাহ বিবি মরিয়মের গর্ভে জন্ম দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ঈসা (আ)-এর জন্মের বেলায় পুরুষ মানুষের শুক্রকীট না লাগলেও স্রষ্টা বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মাটির সারভাগ দিয়ে শুক্র তৈরী করে তাঁকে পয়দা করেছিলেন। নিম্নের আয়াতে এ ধরনের ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। তিনি তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করলেন। তৎপর বললেন 'হও' ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৫৯)

উপরোল্লিখিত আয়াতে ঈসার (আ) জন্ম দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। এ কথা উল্লেখ থাকায় আমরা আদমের ক্ষেত্রেও পিতার সংস্পর্শ ছাড়াই কোন না কোন মাতার জরায়ুতে তাঁর (আদমের) জন্ম হয়েছিল এরূপ চিন্তা করতে পারি।

এখন প্রশ্ন হলো সেই মা কোন শ্রেণীর মানুষ ছিল? এর উত্তরে বলা যায় কোটি কোটি বছর যাবৎ প্রাণীর ক্ষেত্রে যে সাংগঠনিক বিবর্তন ধারা চলে আসছিল, সে প্রক্রিয়ার সবচেয়ে উন্নততর জীব মানুষের (বন্য ও বর্বর মানুষের) কোন এক কুমারী মাতার জরায়ুতে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আজকের মানুষের আদি পিতা ও মাতার জন্ম হয়। এক্ষেত্রে আদম ও হাওয়ার জন্ম হতে কোন জীব মানুষের (বন্য পুরুষ মানুষের) পিতার শুক্র কীটের দরকার

www.pathagar.com

হয়নি। বরং এক্ষেত্রে আল্লাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় মাটি-পানির সংমিশ্রিত উপাদানের সারভাগ দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শুক্রকীটের মতো একক প্রাণ সত্তা (আদি এক কোষী জীব সৃষ্টির পদ্ধতিতে পয়দা করে) সৃষ্টি করে তা হোমো স্যাপিয়ানস গোত্রের জীব মানুষের (বন্য মানুষের) কোন এক কুমারী মাতার গর্ভে (জরায়ুতে) প্রতিস্থাপন করেন। ফলে একক প্রাণ সত্তা (Gemate) নারীর ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলে সেটি (সেখানের একক প্রাণ সত্তা) থেকে 'দু'টি ভ্রূণ' সৃষ্টি হয়। অতঃপর এ ভ্রূণ দু'টি সুরক্ষিত নিরাপদ স্থানে (জরায়ুতে) দিনে দিনে বিকশিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ দু'টি মানুষে রূপ নিয়ে দুনিয়ায় ভূমিষ্ঠ হয়। এদের মধ্যে একজন নারী আর একজন হলো পুরুষ। তাঁরাই পৃথিবীর প্রথম খেলাফতধারী মানব-মানবী। এখানে আদম-হাওয়া একই মার গর্ভ থেকে জন্ম হয়। কারণ হাওয়ার আবির্ভাব ঘটে একক প্রাণ সত্তা (আদম) থেকেই। বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় একটি শুক্রকীট মাতার একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার পর বিভাজিত হয়ে দু'টি মানুষে পরিণত হয়, সে প্রক্রিয়াটি অনেকটা তারই অনুরূপ।

"তোমরা ভয় কর সেই প্রভুকে যিনি এক আত্মা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সহধর্মিনীকে এবং সেই দুইজন (আদম এবং হাওয়া) হতে তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসা : আয়াত ১)

মাটি হতে মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় প্রথমে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু বা শুক্রকীট তৈরী করা হয়। সেটিই কোন সুরক্ষিত (জরায়ুতে) নিরাপদ স্থানে প্রতিস্থাপন করে সেখান থেকেই খেলাফধারী মানুষের আবির্ভাব ঘটানো হয়। নিম্নের আয়াত থেকে সে রকমেরই একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"মাটি হতে আমরা মানুষকে পয়দা করেছি। প্রথমে একটি অতি ক্ষুদ্র জীবাণু গড়েছি এবং তাকে নিরাপদ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তারপর সেই জীবাণুকে ক্রমে একটি রক্তের গুটিকায় : পরে একটি গোশত খন্ডে পরিণত করেছি। তারপর তাতে অস্থিসমূহ সৃষ্টি করে গোশত ও পেশী দ্বারা আবৃত করেছি। তারপর তাকে একটি স্বতন্ত্র মানুষে পরিণত করেছি। এরপর

www.pathagar.com

একদিন অবশ্যই তোমাদের মৃত্যু আসবে এবং মহাবিচারের দিন তোমাদেরকে পুনরায় উত্থিত করা হবে।" (সূরা মুমিনুন : আয়াত ১-৯)

মাটির ভূবনে আদম ও হাওয়া বড় হয়ে ঐশী জ্ঞানের আলোকে পরস্পরকে খুঁজতে থাকেন। এক সময় তাদের দু'জনের দেখা হয়। এরপর থেকে উভয়ই পরস্পরকে নিয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। এদিকে জীব মানুষের (বন্য ও বর্বর মানুষের) প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে। এখানে উল্লেখ্য যে, জীবআত্মার আদম ও হাওয়ার জড় দেহ উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হলে পরম আত্মা (রূহ) রূহানী জগত থেকে পাঠিয়ে (ফুঁকে দিয়ে) তাঁদেরকে পরিপূর্ণ সভ্য মানুষে রূপ দেয়া হয়।

স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আদমের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে জীব মানুষের প্রজাতির ক্ষেত্রে জেনেটিক রূপান্তর ও জেনেটিক বিলুপ্তির ন্যায় দু'টি ঘটনাই এক সাথে ঘটতে থাকে। এর ফলে বন্য মানুষের বিলুপ্তি ঘটে। এই কারণে হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের বন্য মানুষের (কঙ্কাল ছাড়া) কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে জেনেটিক রূপান্তরের মাধ্যমে জীব মানুষ থেকে আদম ও হাওয়ার আবির্ভাব ঘটে। অপর দিকে জীব মানুষের (বন্য ও বর্বর মানুষের) ক্ষেত্রে জেনেটিক বিলুপ্তি (drift) চলতে থাকায় যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে প্রজনন ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলে, ফলে তাদের প্রজাতির ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তি ঘটে। এটি ঘটে জীব মানুষের পিতার শুক্রকীট থেকে Fertilization এ সাহায্যকারী জিন উধাও হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। কি প্রক্রিয়ায় জিনের রূপান্তর ও বিলুপ্তি ঘটে তা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং ও মানব ক্লোনিং-এর সফলতার যুগে এ বিষয়টি বুঝতে আমাদের কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

আদম ও বিবি হাওয়া যে মাতৃজরায়ু (সুরক্ষিত নিরাপদ স্থান) থেকে জন্ম নিয়েছেন সেই মা হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের জীব মানুষের বংশধর। আল-কোরআনের সূরা আনআম-১৩৩ ও সূরা দাহর-২৮-তে সে ধরনের মানুষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এদের প্রজাতি ক্রমেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত

www.pathagar.com

হয়ে গেছে। হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের জীব মানুষের কোন কুমারী নারী বিবি মরিয়মের মতো কোন পুরুষ মানুষের সংস্পর্শ ছাড়াই গর্ভবতী হয়।

আগেও বলেছি আল্লাহ তা'আলার পরম নির্দেশে মাটি ও পানির সারভাগ দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তৈরী শুক্রকীট দিয়ে হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের কুমারী নারী গর্ভবতী হয়। এ শুক্রকীট কোন হোমো-স্যাপিয়ানস পিতার দেহে তৈরী হয়নি। এই গোত্রের মানুষ থেকে আদম ও হাওয়ার আবির্ভাব ঘটাতে শুধু মাতৃ জরায়ুই ব্যবহার করা হয়েছে। এ ঘটনাটি যখন ঘটেছিল তখন পৃথিবীতে বুদ্ধিমান কোন মানুষের অস্তিত্ব ছিলনা। তাই মানুষের মাধ্যমেই ঐ ঘটনাটি ভিডিও করে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু স্রষ্টা ইতিহাস থেকে ঐ ঘটনাটি আড়াল করেননি। বরং সে প্রক্রিয়ায় ঈসা (আ) কে পয়দা করে আদমের অনুরূপ দৃষ্টান্ত রেখে দিয়েছেন। পাশাপাশি আল-কোরআনে সূরা আনআমের ১৩৩ নং আয়াতে তা ব্যাখ্যা করেছেন।

হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের মানুষ সৃষ্টির সাংগঠনিক বিবর্তন ধারার চূড়ান্ত ধাপের একেবারে কাছাকাছির প্রজাতির মানুষ। এরা পশু শ্রেণীর মানব গোষ্ঠী। এ গোত্রের মানুষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার জন্ম হওয়ায় আদমের প্রজাতিতেও পশুর স্বভাবের বংশগতির ধারা চলে আসছে। সাধারণত প্রতিটি প্রাণীর 'জিন' বংশগতির ধারা নতুন প্রজন্মের কাছে বহন করে নিয়ে আসে। অর্থাৎ জিন এর মাধ্যমে পূর্ব পুরুষের গঠন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চলে আসতে থাকে। তাই আদম (আ)কে খেলাফত দিয়ে নবী হিসেবে পাঠানোর পরও যুগে যুগে নবী, রাসূল পাঠাতে হয়েছে। সত্যিকার অর্থে আদম (আ) ও বিবি হাওয়া যদি পশু শ্রেণীর মানুষ থেকে জন্ম না নিতেন তাহলে 'জিন' প্রক্রিয়ায় কখনো আদম (আ)-এর বংশধর থেকে পশুর স্বভাবের মানুষ জন্ম নিত না। অর্থাৎ মানুষের মাঝে পশুত্বই থাকত না।

আমরা জানি আদম (আ) ও বিবি হাওয়া থেকে শয়তানের প্ররোচনায় গন্দম খেয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে এ কথার সাথে আমার গবেষণা তথ্যের কিছুটা দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। কিন্তু এরও সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে।

www.pathagar.com

মানব দেহে রয়েছে জীব আত্মা ও পরম আত্মা। জীব আত্মার আদমের ও হাওয়ার জড়দেহের উদ্ভব ঘটে হোমা-স্যাপিয়ানস গোত্রের একই নারীর গর্ভে। আর পরম আত্মা (রূহ) বা রূহানী আদম ও হাওয়া বেহেশত থেকে নেমে এসে মর্তের জীব আত্মার দেহে প্রতিস্থাপিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। বর্তমান প্রজনন রীতিতে মাতৃগর্ভে ৪/৫ মাস পর রূহ বা পরম আত্মা গর্ভের সন্তানের কলবে প্রতিস্থাপিত হয়। একই রীতিতে আদম ও হাওয়ার "পরম আত্মা" জড়দেহের সাথে মিলিত হয়। এক্ষেত্রে জড়দেহের মৃত্যু আছে। কিন্তু পরম আত্মা অবিনশ্বর।

অনেকে বলেন, আদম ও হাওয়া যদি গন্দম না খেতেন তবে আমাদেরকে পৃথিবীতে আসতে হতো না। আবার অনেকে বলেন, শয়তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলে অভিশপ্ত করে কেন আদম ও হাওয়াকে পৃথিবীতে পাঠানো হলো।

মূলত আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টিই করেছেন পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য। তবে এ পরীক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্য হলো শয়তান সম্পর্কে আদম ও হাওয়ার মেমোরীতে জ্ঞান দিয়ে দেয়া। একটা বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়টি মঞ্চায়ন করে আদম ও হাওয়ার মেমোরীতে জ্ঞানটি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন মিস্ত্রী একটি নৌকা সুরক্ষিত নিরাপদ স্থানে তৈরী করে চালক ব্যতিত বন্দরে নোঙ্গর করে রাখলেন। সবকিছু সম্পন্ন করে ভিন্ন এক অচেনা দেশ থেকে একজন সুদক্ষ চালক পাঠিয়ে দিলেন। চালকের সাথের মাল্লারা সব এদেশের। নতুন চালক নৌকা বেয়ে চলছে। কিন্তু তাকে বন্দরে পাঠানোর আগে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা মঞ্চায়ন করে দেখিয়ে দিলেন। এ ঘটনাটির মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন কে তার প্রকৃত শত্রু। কোন পথে চলার মধ্যে তার কল্যাণ নিহীত। যখন তার ডাক পড়বে তখন নৌকা এ দেশে রেখেই চলে যেতে হবে। এ চলার পথে সে যদি কিছু উপার্জন করে থাকে এটাই তার সম্বল। সে যাওয়ার সময় সাথে কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না। পথ চলার সাথে সাথে ভাল কর্মের মাধ্যমে ভাল সত্তা এবং খারাপ কর্মের মাধ্যমে মন্দ সত্তা উপার্জন হয়। যা তার অজান্তেই তার জন্যে জমা হতে থাকে। এগুলো আলোক উজ্জ্বল বিকীর্ণ

www.pathagar.com

শক্তি (ভাল তথ্য কণা) এবং কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি (মন্দ তথ্য কণা)। অতঃপর কিছুকাল বাণিজ্য করার পর ঐ অদৃশ্য চালক চলে গেলে দুনিয়ার বাহন পচে গলে প্রকৃতির সাথে মিশে যাবে। তাই খেলাফতধারী মানুষের জড়দেহটি তার আসল পরিচয় বহন করে না।

আত্মিক বিভাজনের মাধ্যমে নর, নারী ও শয়তানের উৎপত্তি

সূত্র : ১

ধ্বনাত্মক সত্তা বা প্রত্যক্ষ তথ্য কাঠামো
(Positive Information bit)

[স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি ধ্বনাত্মক তথ্য কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হলো, এ থেকে তথ্য আদান প্রদান হয়]

সূত্র : ২

ধ্বণাত্মক তথ্য কাঠোমো বা তথ্য কণা

কমাণ্ড আদেশ বা নির্দেশক তথ্য কাঠামো

[ধ্বনাত্মক তথ্য কণার প্রেরিত তথ্য মোতাবেক স্রষ্টার থেকে কমাণ্ড আদেশ প্রেরিত হয় এবং উভয়ের ব্যতিচার ক্রিয়ায় ধ্বনাত্মক তথ্য কণাটি বিভাজিত হয়।]

সূত্র : ৩

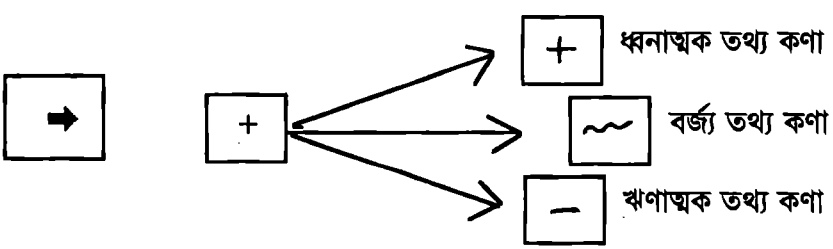

[স্রষ্টার কমাণ্ড আদেশের সাথে ধ্বনাত্মক তথ্য কণার ব্যতিচার ক্রিয়ায় ঐ ধ্বনাত্মক তথ্য কণার অস্তিত্ব থেকেই ঋণাত্মক তথ্য কণা ও বর্জ্য তথ্য কণার উৎপত্তি হয়। এটি আত্মিক পর্যায়ের ঘটনা।]

www.pathagar.com

পৃথিবীর আদি এককোষী প্রাণী বা একক প্রাণ সত্তার বিভাজন

সূত্র : ১

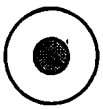

পৃথিবীর আদি এককোষী প্রাণী

[স্রষ্টার নির্দেশে পানিতে পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি হয়।]

সূত্র : ২

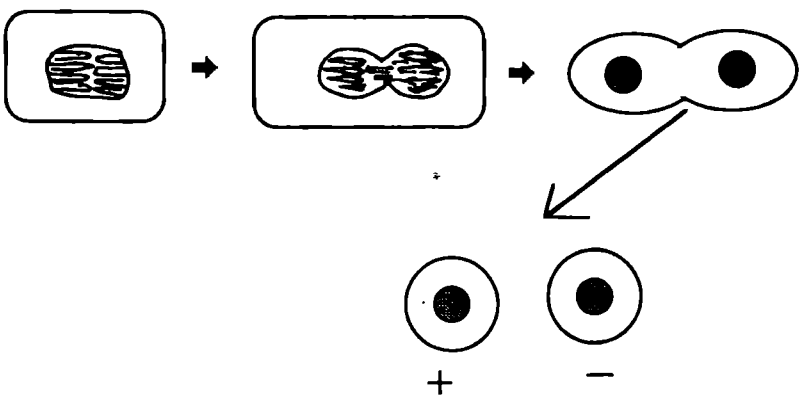

[পৃথিবীর আদি এককোষী প্রাণীর কোষ বিভাজনের মাধ্যমে স্রষ্টার নির্দেশেই তার অস্তিত্ব থেকেই তার সহধর্মীনী বা ঋণাত্মক জাতের উদ্ভব ঘটে।]

সূত্র : ৩

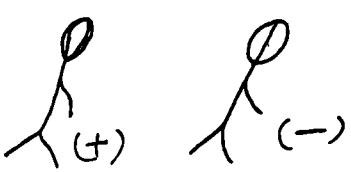

[পৃথিবীর আদি এক কোষী প্রাণী দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে বহুকোষী প্রাণীর চূড়ান্ত রূপ (বিবর্তিত হয়ে) বন্য ও বর্বর মানুষে উন্নিত হয়। সেই বন্য ও বর্বর মানুষের মাতৃগর্ভে থেকেই আদম ও হাওয়ার উদ্ভব ঘটে।]

www.pathagar.com

ভ্রূণ বিভাজনের মাধ্যমে প্রথম মানব মানবীর উদ্ভব

সূত্র : ১

অলৌকিক শ্রুক্রকীট

[এটি আল্লাহর নির্দেশে কাদা মাটি পানির মিশ্রণ থেকে উৎপন্ন হয়।]

সূত্র : ২

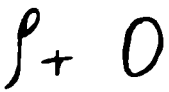

[বন্য ও বর্বর মানুষের (হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের মানুষ) নারীর ডিম্বাণুর সাথে ঐ নারীর জরায়ুতে অলৌকিক শ্রুক্রকীট ও ডিমটি Fertilized (নিষিক্ত) হয়।]

সূত্র : ৩

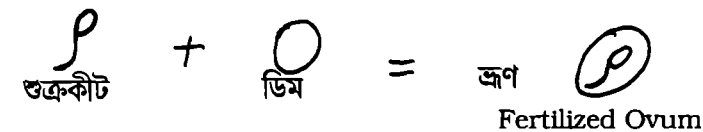

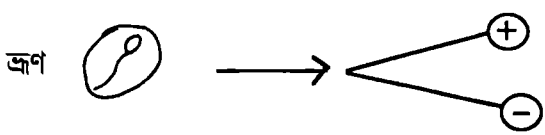

[একটি নিষিক্ত ডিম(Fertilized ovum) বিভাজিত হয়ে একজন নর ও একজন নারীতে পয়দা হয়, একই বন্য ও বর্বর মানুষের নারীর জরায়ু (সুরক্ষিত স্থানে) হতে]

সূত্র : ৪

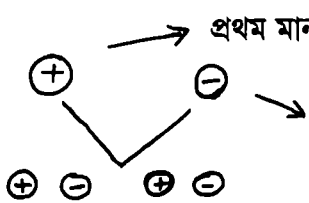

[এদের মিলনে যৌন প্রজনন রীতিতে অসংখ্য নর-নারীতে দুনিয়া ভরপুর হয়ে যায়। সাথে সাথে বন্য ও বর্বর মানুষের প্রজাতির ঘটে বিলুপ্তি।]

www.pathagar.com

আদম হতে তার সঙ্গীনী সৃষ্টির প্রসঙ্গ

"(আল্লাহ) সেই একক সত্তা যিনি গঠন করেছেন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে এবং তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী এবং সেই দুইজন (আদম ও হাওয়া) হতে তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসা ৪ : আয়াত-১)

"এবং তিনি সমস্ত জিনিসের যুগল সৃষ্টি করেছেন। (৪৩ : ১২)

মহাবিশ্ব সর্বদাই সম্প্রসারণশীল। মূলত মহাবিশ্বের এ সম্প্রসারণ নীতি সর্বদাই আদি একক (Singularity) থেকে শুরু হয়। কিন্তু শুরু থেকেই বহু হতে বহু ধরনের সৃষ্টির উৎপত্তি হওয়া স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের নিয়ম বহির্ভূত। তাই স্রষ্টা সৃষ্টির সূচনার আদিতে প্রত্যেক জিনিসের নমুনা বা ডাইছ উৎপন্ন করেন। বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে সৃষ্টির সূচনার ক্ষেত্রে "আদি একক" হিসেবে একটি সংকোচিত বিন্দুর অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। এ হিসেবে একটি মাত্র সংকোচিত বিন্দু থেকে মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও শক্তির উৎপত্তি ঘটে। অতঃপর সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি সর্বদাই সম্প্রসারিত হচ্ছে।

বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকগণ আদিম মহাবিষ্ফোরণ" (বিগ ব্যাংগ) নামের এক মহা কেলেঙ্গারী সূচনা করেন ঐ সংকোচিত বিন্দু থেকে। তাদের "আদিম মহা বিষ্ফোরণ" নামের তত্ত্বে Positive (ধ্বনাত্মক) বা Negative (ঋণাত্মক) সত্তা উৎপত্তি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। তারা ভেবেও দেখেনি "আদি একক" (Singularity)-এর ক্ষেত্রে একই সাথে ধ্বনাত্মক ও ঋণাত্মক সত্তা উৎপত্তি হওয়া কতটা যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু পরম প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিভাবে পুরুষ (+) ও স্ত্রী (-) সত্তার উৎপত্তি ঘটিয়েছেন তার ব্যাখ্যা আল-কোরআনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। উপরোল্লিখিত সূরা নিসার ১নং আয়াতে বলা হয়েছে মানব জাতির সমস্ত সদস্যকে একমাত্র ব্যক্তি (পুরুষ) হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার

www.pathagar.com

থেকেই তার সঙ্গীনী (স্ত্রী) সৃষ্টি করেন এবং তাদের মাধ্যমে সকল পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

জগতের সকল সৃষ্টির মূল উপাদান হলো তথ্যকণা। সৃষ্টির ক্ষেত্রে "আদি একক" হিসেবে যে তথ্য কণার উৎপত্তি ঘটে সেটি হলো Positive Information bit বা ধ্বনাত্মক তথ্য কণা। তারপর এ ধ্বণাত্মক তথ্য কণা থেকে উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় Negative Information bit বা ঋণাত্মক তথ্য কণার উৎপত্তি ঘটে। এ পর্যায়ে পৃথক যৌনাঙ্গ সৃষ্টি হয়নি।

অতঃপর পৃথিবীর আদি এক ও অভিন্ন প্রাণ সত্তা বা একক জীবকোষের আবির্ভাব ঘটে সাগরের লোনা পানিতে। এ জীবকোষে 'জিন' নামের যে জটিল উপাদান থাকে তার কার্যক্রমের ধারা হলো তথ্য প্রেরণ ও তথ্য গ্রহণ করা। পৃথিবীর এই আদি প্রাণ সত্তা বা একক জীবকোষ (প্রোটোজোয়া) যখন বিভাজিত হয় তখন সেটি ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়ে যায়। এ ধরনের বিভক্তির সময় Positive Information bit বা ডি.এন.এ (DNA) টেপ ভেঙ্গে দ্বিখণ্ডিত হয়। এতে পূর্ববর্তী প্রজন্মের বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রজন্মের বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী প্রজন্মে প্রবেশ করার সময় সামান্য কিছু রূপান্তরিত হয়। এককোষী কিংবা বহুকোষী সকল প্রাণীর বেলায় আদি সেই কোষ বিভাজন পদ্ধতি আজও চালু আছে। এ ধরনের কোষ বিভাজন পদ্ধতি বিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। তবে এ পর্যায়েও যৌনতাসম্পন্ন পার্থক্যসূচক অঙ্গ সৃষ্টি হয়নি। বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ পার হয়ে এক কোষী জীব থেকে যখন বহুকোষী জীবের উদ্ভব ঘটে তখন এর মধ্যে যৌনতা সম্পন্ন প্রজননধর্মী অঙ্গের প্রথম সূত্রপাত ঘটে, 'স্পঞ্জ' এর ক্ষেত্রে। কিন্তু দৈহিক গঠন দেখে এদের পার্থক্য করা খুব কঠিন।

সৃষ্টির আদিতে পরম প্রতিপালকের পরম ইচ্ছায় এক অভিন্ন প্রাণ সত্তার আবির্ভাব ঘটে রূহানী জগতে। তারপর দুনিয়ার ক্ষেত্রে এককোষী জীবের উদ্ভব ঘটে। এদের থেকেই তাদের জোড়া সৃষ্টি হয়। স্রষ্টার প্রত্যক্ষ ইচ্ছায় যার উদ্ভব ঘটে তার নাম Positive (প্রত্যক্ষ) বা ধ্বনাত্মক সত্তা। আবার

www.pathagar.com

এ সত্তার ইচ্ছাতে তার অস্তিত্ব থেকে যে সত্তার উদ্ভব ঘটে তার নাম Negative (পরোক্ষ) বা ঋণাত্মক সত্তা। তারপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সৃষ্টির যৌন মিলনে ও জেনেটিক রূপান্তরের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে বিবর্তনের ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত চরিত্র, দৈহিক গঠন ইত্যাদির ভিন্নতার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী নিয়ে আস্তে আস্তে দুনিয়া ভরে যায়।

এর মধ্যে মানব প্রজাতির উন্নতর মডেল আদম (আ) ও বিবি হাওয়া ও তাঁদের বংশধরও বিদ্যমান। তাই বলা যায় মানুষসহ সকল জীবই যেমন একটি মাত্র জীব বা একক প্রাণ থেকে উদ্ভব হয়েছে তেমনি আদম থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি হয়েছে। তারপর এ দু'জনের মাধ্যমে বংশগতির ধারা অব্যাহত থাকায় পৃথিবী আজ মানব প্রজাতির পদভারে কোলাহলমুখর।

আমি আবারও বলছি আদি প্রাণ সত্তার বিকাশ ঘটে বা সঙ্গীনী সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ঘটে নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার মতো। এর ফলে আদি একক প্রাণ সত্তা থেকে তার সঙ্গীনীসহ শয়তান বা বর্জ্য তথ্য কণারও উৎপত্তি ঘটে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সঙ্গীনী সৃষ্টি হয় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে। দুনিয়াতে আদমের সঙ্গীনী সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি শুরু হয় একমাত্র জীবন্ত জীব কোষ থেকে। কারণ পানি হচ্ছে জীবন্ত জীবকোষ গঠনের প্রধান উপাদান। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো একটা বহুকোষী পূর্ণাঙ্গ মানুষ থেকে কখনো বিভাজিত বা দ্বিখণ্ডিত হয়ে তার সঙ্গীনীর উদ্ভব ঘটেনি। এ ধরনের কোন ইতিহাস নেই বা এটা কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াও নয়। তবে মাতৃগর্ভে একটি শুক্রকীট (একক প্রাণ সত্তা) একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলে সেটি বিভাজিত হয়ে দু'টি ভ্রূণে বিভক্ত হয়ে দু'টি মানুষে পরিণত হতে পারে।

এটি সমাজিক ভাবে ও বৈজ্ঞানিক ভাবে স্বীকৃত। কারণ একজন মায়ের গর্ভ থেকে দু'টি সন্তান হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে আদমের সঙ্গীনি সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়াটি অনেকটা এমনই বুঝা যায়। অতঃপর এ দু'জনের মাধ্যমেই স্রষ্টা পৃথিবীতে বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন। নিম্নে হাদীসে কুদসীতে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে।

www.pathagar.com

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মানবকুল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে ভাগ করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।" (আল-হাদীস)

আত্মিক পর্যায়ে আদমের ইচ্ছার ব্যগ্রতা থেকে তার অস্তিত্বের অংশ দিয়ে তার সঙ্গীনী সৃষ্টি করা হয়। পদার্থের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ায় যখন নিউটন দিয়ে প্রোটনকে আঘাত করা হয় তখন প্রোটন থেকে চেইন বিক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে নতুনের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এ সময় জগতের ক্ষতিকারক পারমাণবিক শক্তিও বের হয়। এ শক্তিকে পরিকল্পিত ভাবে ভাল কাজেও লাগানো যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যখন আত্মিক পর্যায়ে আদমের অস্তিত্ব থেকে তার সঙ্গীনি সৃষ্টি করা হয় তখন তার অস্তিত্ব থেকে বর্জ্য তথ্য কণা বা শয়তানেরও উৎপত্তি ঘটে। হাদীসে কুদসীতেও এর অনেকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়–

"আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে পয়দা করলেন, তাকে পয়দা করে তার ডান কাঁধে করাঘাত করলেন, তারপর তাঁর সন্তানদেরকে বের করলেন; এরা এরূপ শুভ্র যেন মুক্তার মত উজ্জ্বল দুগ্ধ। তারপর তিনি তাঁর বাম কাঁধে করাঘাত করলেন এবং কৃষ্ণকায়া সন্তান বের করলেন, যেন তারা কাল কয়লা। তারপর তিনি তার ডান হাতের সন্তানগণ সম্বন্ধে বললেন, এরা জান্নাতবাসী হবে আর এতে কোন পরওয়া নাই। আর তাঁর বাম হাতের তালুস্থিত সন্তানদের সম্বন্ধে বললেন, এরা জাহান্নামে যাবে, আর এই ব্যাপারে কোন পরওয়া নাই।" (হাদীসে কুদসী)

এখানে কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি বা কৃষ্ণকায়া সন্তান এর সাথে "বর্জ্য তথ্য কণার" সম্পর্ক রয়েছে। যা নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার সময় পারমাণবিক শক্তি বা বর্জ্যশক্তি হিসেবে বের হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এক ব্যক্তি হতে তার সঙ্গীনি পয়দা হওয়া অবিশস্বাস্য কিছু নয়। এ যুগের বিজ্ঞান কোরআনের শাশ্বত বাণীর সত্যতা প্রমাণে সচেষ্ট। তাই এখন আর কেউ আদম থেকে যে তার সঙ্গীনী পয়দা হয়েছে, এ কথা অবিশ্বাস করে না।

www.pathagar.com

তবে আদমকে বিভিন্ন দেশের মাটি দিয়ে মূর্তির মতো তৈরী করে রেখে দেওয়ার পর তার অস্তিত্ব থেকে পূর্ণাঙ্গ একটি নারী (হাওয়া) বের হয়ে গেল, এ ধরনের যুক্তির কতটা নির্ভরতা আছে তা ভেবে দেখার বিষয়। আমার যুক্তিতে পৃথিবীর ক্ষেত্রে আদম থেকে তার সঙ্গীনী পয়দা হওয়ার দৃষ্টান্ত হলো-আল্লাহ তা'আলা নির্বাচিত মৃত্তিকা দিয়ে শুক্রবিন্দু তৈরী করে সেটি রাখলেন এক সুরক্ষিত স্থানে, সেখানে ঐ শুক্রকীট বা একক জীব কোষ মাতার ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলে তার থেকে দু'টি মানুষের (বিভাজিত হয়ে) ভ্রূণ তৈরী হয়। এ ভ্রূণ দু'টি থেকে পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবীর উদ্ভব ঘটে। এখানে মা হলো বন্য প্রজাতির মানুষের (হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের নারী) প্রজন্মের নারী। এ ক্ষেত্রে শুক্রকীট কোন বন্য প্রজাতির পুরুষ মানুষের দেহে উৎপন্ন হয়নি। এ শুক্রকীট পরম স্রষ্টার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মাটির সার অংশের মাধ্যমেই উৎপন্ন হয়। এভাবে মাতৃগর্ভে একটা শুক্রকীট দিয়ে একটা ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে দু'টি ভ্রূণে বিভাজিত হওয়া বিজ্ঞান সম্মত। মূলত এ প্রক্রিয়ায় একের থেকে তার সাথী বা সঙ্গীনী সৃষ্টি হওয়াই বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত পথ। এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ একটি পুরুষ মানুষ বিভাজিত হয়ে তার অস্তিত্ব থেকে (ভিন্ন কাঠামোর স্ত্রী অঙ্গসহ) অন্য আর একটি মানুষের উদ্ভব হওয়া সম্ভব বলে ধরে নেয়া যায় না। অপরদিকে আদমের বাম বুকের পাজরের বাঁকা হাড় দিয়ে তার সঙ্গীনী পয়দা করা হয়েছিল, এটাও বিশ্বাস যোগ্য নয়। এ কথা কোরআন বা সহীহ হাদীসের কথা নয়। এটি বাইবেলের উক্তি। এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবে এর দার্শনিক ব্যাখ্যা হলো আদমের ইচ্ছার ব্যগ্রতা থেকেই তার অস্তিত্বের অংশ দিয়ে তার সঙ্গীনী পয়দা করা হয়। এক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার ব্যগ্রতা উদয় হয় বুকের বাম অংশের বাঁকা পাঁজর বেষ্টিত হৃৎপিণ্ডের গুপ্ত স্থান থেকে। এখানেই রূহ বা প্রাণের অবস্থান। সে কারণেই হয়ত আদমের সঙ্গীনী সৃষ্টিতে বাঁকা পাঁজরের কথা এসেছে। অথবা ভ্রূণ বিভাজনের জন্যও এটা বলা হয়ে থাকতে পারে। বাইবেলের সে বাণীটি নিম্নে তুলে ধরা হল।

"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মানুষের একাকী থাকা ভাল নয়। আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্মাণ করি। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর

www.pathagar.com

মৃত্তিকা হইতে বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্মাণ করিলেন, পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন, তাহা জানিতে সে সকলকে তাহার নিকট আনিলেন, তাহাতে আদম যে সজীব প্রাণীর নাম রাখিলেন, তাহার সে নাম হইল। আদম যাবতীয় গ্রাম্য পশুর ও খেচর পক্ষীর ও যাবতীয় বন্য পশুর নাম রাখিলেন, কিন্তু মানুষের জন্য তাঁহার সহকারীনি পাওয়া গেলনা। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন, আর তিনি তাহার একখানা পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পুরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাহাকে আদমের নিকট আনিলেন। তখন আদম কহিলেন;এবার (হইয়াছে); ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস, ইহার নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন। এই কারণে মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে। ঐ সময়ে আদম ও তাঁহার স্ত্রী উলঙ্গ থাকিতেন; আর তাহাদের লজ্জাবোধ ছিলনা।" (বাইবেল দ্বিতীয় অধ্যায়, বাণী ১৮ থেকে ২৫)

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি জগৎ সৃষ্টির সূচনাও করেছেন এক ও অদ্বিতীয় প্রাণ সত্তা থেকেই। তাই সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণু পর্যন্ত একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একক প্রাণ সত্তার (পুরুষ) ইচ্ছার ব্যগ্রতা থেকে তার অস্তিত্বের অংশ দিয়ে যদি তার সঙ্গীনী সৃষ্টি না করা হতো তাহলে পুরুষ কখনো স্ত্রী সঙ্গীনীর দিকে ফিরে তাকাত না। এমন কি তারা একে অন্যের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতো না।

বলা হয় আদম (আ) কে সৃষ্টি করার পর তিনি একাকিত্ববোধ করছিলেন। তাঁর মাঝে ছিল সঙ্গীনী পাওয়ার ব্যগ্রতা। ছিল সাথী বিহীন জীবনের অতৃপ্তি ও ক্ষুধা। তার সাথে ছিল কথোপকথনের বা বৈধ প্রেমালাপের গভীর আকুতি। আদমের (Positive Information bit) ইচ্ছার ব্যগ্রতা নিমিষেই স্রষ্টার কাছে পৌছে যায় তখন স্রষ্টার নির্দেশে তার অস্তিত্বের অংশ থেকেই তার সঙ্গীনী পয়দা হয়। আত্মিক পর্যায়ে "ধ্বনাত্মক তথ্য কণাতে ছিল তথ্য গ্রহণ ও প্রেরণ করার মতো গুণ। তার পাশাপাশি ছিল

www.pathagar.com

অভাববোধ। এ থেকেই তার সঙ্গীনী পাওয়ার অভাব বোধ বা আকাংখা জাগ্রত হয়। তাই আদম (আ) সঙ্গীনী পাওয়াতে উল্লসিত হন।

মহাবিশ্বের বিবর্তন প্রক্রিয়াতে তিনটি পর্যায়ে একক প্রাণ সত্তা থেকে তার সঙ্গীনীর উদ্ভব ঘটে। প্রথম ঘটে আত্মিক পর্যায়ে। সেটা ছিল নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার মতো দ্বিখণ্ডিত হওয়ার প্রক্রিয়া তারপর ঘটে কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে একটি জীবকোষ যখন দ্বিখণ্ডিত হয় তখন নিউক্লিয়াসের ৪৬টি ক্রোমোজোমই সমান ভাগে বিভক্ত হয়। এ প্রক্রিয়াকে বলে মাইটোসিস (Mitosis)। তারপর চূড়ান্ত পর্যায়ে আবার একক প্রাণ সত্তা (শুক্রকীট) একটি ডিম্বানুকে নিসিক্ত করে। মিউসিস (Meosis) প্রক্রিয়ায় জননযন্ত্রে দু'টি ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়ে পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী হিসেবে আবির্ভাব হয়। তবে পৃথিবীতে আজকের ন্যায় আধুনিক মানুষের জন্ম হতে অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিবর্তন ও রূপান্তর কাজ করেছে। এ রূপান্তর প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়েছে জেনেটিক কোড এর নিয়মে। যখনি নব প্রজাতির মানুষ আগমনের পথ সুগম হয়েছে তখনি পুরাতন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। এ ধরনের রূপান্তর প্রক্রিয়া ঘটেছে মাতৃগর্ভে মানব ভ্রুণের ক্ষেত্রে। কোন কোন ক্ষেত্রে জেনেটিক রূপান্তর ও বিলুপ্তির কাজ পাশাপাশি ঘটেছে।

উপসংহারে বলতে চাই আমার এ সব বক্তব্য পড়ে অনেকের মনে বিতর্ক ও নতুন নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে। তাই আমি এ বইয়েই বিতর্কের অবসান ও সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা রেখেছি। আশা করি এ থেকে চিন্তাশীল মানুষের মনের ক্লান্তি দূর হতে পারে। আল্লাহই সকল বিষয়ে ভাল জানেন।

www.pathagar.com

বিতর্ক ও সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর

যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, আদম (আ) ও বিবি হাওয়া পৃথিবীর আদি মানব-মানবী। তার আগে পৃথিবীতে আর কোন মানুষ ছিল না। একথা একশত ভাগ সত্য এ ভাবে যে, আদম (আ) ছিলেন পৃথিবীর প্রথম খেলাফত ধারী মানুষ এবং হাওয়া ছিলেন তাঁর সঙ্গীনী। তাঁদের ছিল ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা। তাঁরা ন্যায়-অন্যায় যাই করুক না কেন, ফেরেশতাগণের ছিল তাঁদের কর্মের আনুগত্য করার হুকুম। কিন্তু তাঁদের আগেও পৃথিবীতে নিম্নধাপের মানুষ বসবাস করত। তারা ছিল বন্য, বর্বর, পশু শ্রেণীর জীব আত্মার মানুষ। তাদের পরম আত্মা ছিল না। তাদের ছিল না ভাষা জ্ঞান এবং ছিল না ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা। তারা অন্যায় ও রক্তারক্তি করলেই তাদেরকে ফেরেশতাগণ আযাব-গজব দিয়ে শাস্তি দিত। তারা এতই বর্বর ছিল যে, তারা পরস্পর সর্বদাই রক্তারক্তি ও ঝগড়া-বিবাদে লেগে থাকত। আল কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে এ ধরনের মানুষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"হে রাসূল (স্মরণ করুন) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা পাঠাচ্ছি। তখন তারা বলল, আপনি কি এমন কাউকে নিয়োগ করতে চান, যে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং খুনাখুনি করবে? আমরাই তো আপনার তাসবীহ ও তাকদীস করছি। তখন আল্লাহ বলেন আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" (সূরা বাকারাহ)

ফেরেশতাগণ পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন কথাই বলতে পারে না। তাদেরকে কোন কাজের দায়িত্ব দেয়ার আগে সে সম্পর্কে পূর্বেই জ্ঞান দিয়ে দিতে হয়। ফেরেশতাগণের পূর্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আদমের আগেও পৃথিবীতে বন্য ও বর্বর পশু শ্রেণীর মানুষ বসবাস করত। বর্তমানে পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে কোথাও পশু শ্রেণীর মানুষ বন-

www.pathagar.com

জঙ্গলে বাস করতে দেখা যায় না। তাই প্রশ্ন জাগতে পারে এদের প্রজাতি গেল কোথায়? কিন্তু নিম্নের আয়াত থেকে এদের প্রজাতির যে বিলুপ্তি ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"তিনি (আল্লাহ) চাইলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং তিনি যাদেরকে চাইবেন, উত্তরাধিকারী হিসেবে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন-ঠিক যেভাবে অন্য মানুষের বংশধর হতে তোমাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন।" (৬ : ১৩৩)

ধর্ম ও বিজ্ঞান পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব নিয়ে নিজ নিজ পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়েছে। গবেষণাহীন ধর্মীয় ব্যাখ্যাতে যেমন রয়েছে প্রচুর কুসংস্কার তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তনবাদে রয়েছে মনগড়া তথ্য। এর ফলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চলছে বিতর্ক ও বাদানুবাদ। কিন্তু আধুনিক কালের গবেষণাধর্মী ধর্মীয় ব্যাখ্যায় যেমন জীবনের সাংগঠনিক উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের পক্ষে রায় পাওয়া যায় তেমনি বিজ্ঞানের সর্বশেষ গবেষণায়ও সে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এরপরও আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার দুনিয়াতে আবির্ভাব নিয়ে এখনও কোন সঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ সাংগঠনিক বিবর্তনের রূপটা কেমন ছিল, কোন পদ্ধতিতে তাঁরা পৃথিবীতে আসলেন তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ডঃ মরিস বুকাইলি তাঁর লেখা "মানুষের আদি উৎস" বইয়ে সাংগঠনিক বিবর্তনের পক্ষে জোরালোভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি সাংগঠনিক বিবর্তনের পদ্ধতিটা কোন ধরনের ছিল তা বলেননি। সম্প্রতি প্রকাশিত "মানুষ ও মহাবিশ্ব" গ্রন্থে "বিবর্তন সম্পর্কে জোরালো সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, "বিবর্তনবাদ একটা ভাল তত্ত্ব। সম্ভবতঃ মানুষ (তথাকথিত আধুনিক মানুষ) বাদে অন্যান্য সব প্রাণী বিবর্তনের মাধ্যমেই আবির্ভূত হয়েছিল।" পৃষ্ঠা-৯১

ঐ বইয়ের ৯৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে- "যাহোক আদম ও হাওয়া জান্নাত থেকে এসেছিল ধরে নিলে, বিবর্তনবাদের সাথে কোন বিরোধ নেই বরং

www.pathagar.com

পূর্বে বর্ণিত সূরা নূর-এর ৪৫ নং আয়াত বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে ইঙ্গিত দেয়। সম্ভবত মানুষ বাদে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণী আল্লাহ বিবর্তনের মাধ্যমেই সৃষ্টি করেছেন।"

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, এ বইয়ের লেখক ডারউইনের বিবর্তনবাদের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। মূলতঃ ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে রায় দেয়। এ থেকে স্রষ্টার অভিব্যক্তির কোন প্রকাশ পাওয়া যায় না। তবে বিবর্তন যে হয়েছে এটা সত্য। এ বিবর্তন স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন। এ বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীর সব প্রাণীসহ আধুনিক মানুষেরও আবির্ভাব যে ঘটেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। আল-কোরআনের বেশ কিছু আয়াত থেকে বিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিম্নে আয়াতগুলো উপস্থাপন করা হলো–

"আল্লাহ সমস্ত প্রকারের প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে।" (সূরা নূর : আয়াত ৪৫)

"(আল্লাহ) সেই একক সত্তা যিনি মানুষকে পানি হতে গঠন করেছেন।" (৪ : ১)

'আমরা মানুষকে গঠন করেছি কর্দম থেকে, নকশা কাটা নরম মাটি থেকে।" (সূরা হিজর আয়াত ২৬)

"তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি সমস্ত জিনিসকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের সৃষ্টি শুরু করেছেন কাদা মাটি হতে এবং পরবর্তী বংশধরদের সৃষ্টি করেছেন ঘৃণিত পানির নির্যাস থেকে। অতঃপর ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন এবং তার মধ্যে স্বীয় আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা অতি অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" (৩২ : ৭-৯)

"আমরা গঠন করেছি মানুষকে কাদা মাটির বিশুদ্ধ সারভাগ থেকে।" (২৩-১২)

"তোমরা ভয় কর সেই প্রভুকে যিনি এক আত্মা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা হতে সৃষ্টি করেছেন তার সহধর্মীনীকে এবং সেই দুইজন (আদম এবং

www.pathagar.com

হাওয়া) হতে তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে সারা দুনিয়া ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসা : আয়াত ১)

ডারউইন জীবের আঙ্গিক গঠন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভব হওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি "যোগ্যতমের টিকে থাকা" পদ্ধতির মাধ্যমে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, প্রকৃতি নিজেই সবলদের সংরক্ষণ করে এবং দুর্বলদের বাদ দিয়ে দেয়। অর্থাৎ দুর্বলদের বিলুপ্তি ঘটে এবং সবলরা টিকে থাকে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, তিনি চাইলেই বিলুপ্তি ঘটে এবং তিনি সে স্থান নতুনদের মাধ্যমে পূরণ করেন। সুতরাং কোন প্রজাতির বিলুপ্তি ও নতুনের উদ্ভব স্রষ্টার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল এবং তিনিই প্রত্যেক জিনিসের আকার, আকৃতি, স্বভাব দান করেন। তাই ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন ভিন্ন প্রকৃতির ধারণা দিয়ে থাকে। দু'টি ধারণা ভিন্ন হলেও আদম ও হাওয়ার জড়দেহ যে পৃথিবীর জীব মানুষের (বন্য মানুষের) থেকে উদ্ভব হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

অপর দিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা ছাড়াই আদম ও হাওয়ার দুনিয়ায় আবির্ভাব সম্পর্কে এমন সব তথ্য আবিষ্কার করা হয়েছে, যার কোন সহীহ দলিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নিম্নে মাসিক মদিনার মে, ২০০২ সংখ্যার ২৭নং পৃষ্ঠার এমনি একটি তথ্য তুলে ধরা হলো।

"আল্লাহ-তা'আলা প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) কে কুদরতী হাতে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে রূহ ফুঁকে দেন। অতঃপর আদমের (আ) সঙ্গিনী মানব জাতির আদি মাতা মা হাওয়াকে আদমের পাঁজর থেকে সৃষ্টি করেন। তাঁরা তখন জান্নাতে ছিলেন। পরে আল্লাহর একটি নির্দেশ লঙ্ঘন করে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করার অপরাধে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হন। জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হবার ফলে আদম (আ) অবতারিত হন সরন্দ্বীপে, বর্তমান শ্রীলংকায়। আদম (আ) অবতারিত হয়েছিলেন একটা পর্বতের ওপর যেটি

www.pathagar.com

আদম পর্বত নামে খ্যাত। সে পর্বতের শীর্ষ দেশে বিরাট আকৃতির একটা মানুষ্য পদচিহ্ন আজও অংকিত আছে। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ফুট ছয় ইঞ্চি চওড়া পদচিহ্ন খানা হযরত আদমের বলে নির্ভরযোগ্য তফসীর ও ইতিহাসের গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে।" (মাসিক মদীনা মে, ২০০২)

আবার "আদম ও শয়তান' নামক গ্রন্থে আদমকে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বর্ণনা রয়েছে। মূলতঃ এসব বর্ণনার কোরআন ও হাদীসের কোন দলিল নেই। এগুলো পৌরণিক কাহিনীর মতো। যা আল-কোরআন নাজিলের আগে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা। মাসিক মদিনার লেখক যে তথ্য দিয়েছেন, সেখানে তিনি লিখেছেন আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে বেহেশতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু লেখকের জানা উচিত ছিল যে, বেহেশতে কখনো মাটির জিনিস রাখার স্থান নয়। আর আদমের বুকের পাঁজর দিয়ে তার সঙ্গীনি সৃষ্টির কথাটি কোরআন, হাদীসে, কোথাও নেই। তবে এ ধরনের কথা বাইবেলে উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় পরম আত্মার আদম ও হাওয়া জড়দেহ মাটির সারভাগ দিয়েই জননযন্ত্রের মাধ্যমে উদ্ভব ঘটানো হয়। যখন তাদের জড়দেহ স্রষ্টার সাংগঠনিক উদ্দেশ্যমূখী বিবর্তন প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত রূপ নেয়, তখন পরম আত্মার আদম ও হাওয়া তাদের জড়দেহে স্রষ্টার নির্দেশে প্রবিষ্ট হয়। একটা মানুষ যখন মারা যায় তখন আমরা বলি "অমুক" সাহেব মারা গেছেন। অথচ তার জড়দেহ দুনিয়াতেই থাকে। কিন্তু জড়দেহ আসল মানুষ হলে, আমরা কখনো এ কথা বলতাম না। মূলতঃ যে মানুষের আসল পরিচয় বহন করে সে সকলের অজান্তেই চলে যায়।

এ অর্থে আদম ও হাওয়ার বেহেশতে থাকার ব্যাপারটি পরম আত্মার সাথে সম্পর্কিত। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ ও জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার বিষয়টি তাদেরকে শয়তান সম্পর্কে ঐশী জ্ঞান দিয়ে দেয়ার সাথে সম্পর্কিত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় বর্তমানে মাতৃগর্ভে যেভাবে সন্তানের রূহ দিয়ে দেয়া হয়, আদম ও বিবি হাওয়ার ক্ষেত্রে একই রীতি প্রযোজ্য ছিল।

www.pathagar.com

তাই শ্রীলংকায় ও জিদ্দায় তাঁদের দু'জন অবতারিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সূরা আনআমের ১৩৩নং আয়াতে যেমন মানব প্রজাতির রূপান্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তেমনি পূর্বের কাঠামোর মানব প্রজাতির বিলুপ্তির ধারণা রয়েছে। রূপান্তর ও বিলুপ্তি দু'টিই জেনেটিক পর্যায়ে ঘটে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আদম (এক আত্মা) থেকে যেহেতু তার সঙ্গীনী সৃষ্টি করা হয়েছে, সেহেতু আদম ও হাওয়া একই জনন যন্ত্র (জরায়ু) থেকে জন্ম হয়েছিল। আমার গবেষণালব্ধ তথ্য আমাকে এমনি ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করেছে। অথচ এ তথ্য কোরআন ও বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তবে পূর্বের প্রচলিত তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তা। আদম ও হাওয়ার জড়দেহ যে পৃথিবী মাটির সারভাগ দিয়ে পৃথিবীতেই উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তা নিম্নের আয়াত থেকে অনুধাবন করা যায়।

"বরং আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ভুত করেছেন ভূমি হতে উদ্ভিদের ন্যায়। অতঃপর তিনি উহাতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এবং তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে বের করবেন-এক (নতুন) জাত হিসাবে।" (সূরা নূহ : আয়াত ১৭ ও ১৮)

"তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন জমিন থেকে।" (১১ : ৬১)

"(আল্লাহ) মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কর্দম থেকে।" (৩২ : ৭)

মাটি থেকে বীজ বা কাণ্ডের মাধ্যমে নতুন গাছের জন্ম হয়। এর জন্য মাটিতে (জমিতে) চাষ দিতে হয় অথবা চাষ ছাড়াও গাছ জমিতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রে বীজ বা কাণ্ডের প্রয়োজন। অর্থাৎ উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য মাটি, পানি, বীজ লাগবেই। এ তিনটি উপাদান একত্র হলেই উদ্ভিদ জন্মাবে, এটাই রীতি। আর মানুষ জন্মানোর জন্যে লাগে নারীর জননযন্ত্র (সুরক্ষিত স্থান), শুক্রকীট আর ডিম্বাণু। একটা শুক্রকীটকে যদি মাটিতে পুঁতে রাখা হয় তবে সেখান থেকে মানুষ জন্মাবে, এমন কোন প্রক্রিয়া পৃথিবীতে চালু নেই। তবে মাটি পানির সংমিশ্রণে সৃষ্টি এককোষী অ্যামিবার ন্যায়, শুক্রকীট সৃষ্টি করে, সেটি যদি কোন সুরক্ষিত স্থানে

www.pathagar.com

(জরায়ুতে) সংস্থাপন করা হয় তবে সেখান থেকে মানুষ তৈরী পারে। এ ধরনের রীতি বা প্রথা মানুষের ক্ষেত্রে চালু আছে। এখানে ভূমি থেকে মানুষের উদ্ভূত হওয়ার ব্যাপারটি অনেকটা এরূপ। কিন্তু এ ব্যাপারটাকে অনেকে অন্য ভাবে চিন্তা করছেন। তাদের ধারণা মাটি থেকেই যেহেতু মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই মাটির মূর্তি বানানো ছাড়া মানুষ সৃষ্টি করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাদের এ ধরনের ধারণা কোরআন ও বিজ্ঞানের পরিপন্থী। তবে আমার বর্তমান তথ্য অতীতের সকল তথ্যের ব্যতিক্রম। তাই পাঠকের মনে বিতর্ক ও প্রশ্নের ঝড় উঠতে পারে। সে দিক বিবেচনা করে আমি কিছু সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর এ অধ্যায়ের সাথে সংযোগ করেছি।

নিম্নে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার উত্তর দেয়া হল–

প্রশ্ন ঃ আদমের আগেও পৃথিবীতে মানুষের কোন প্রজাতি ছিল কি?

উত্তর ঃ আদমের আগেও পৃথিবীতে পশু শ্রেণীর মানুষের প্রজাতি ছিল। এরা ছিল জীব আত্মার বন্য ও বর্বর মানুষ। তাদের মস্তিষ্কের আকৃতি ছিল বর্তমান মানুষের চেয়ে কিছুটা ছোট। তাই তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ছিল স্রষ্টার মনোনিত প্রতিনিধিদের তুলনায় অনেক কম। তারা ছিল প্রতিহিংসাপরায়ণ, ঝগড়াটে স্বভাবের। পাহাড়ের গুহায়, বড় বড় গাছের আড়ালে দলবদ্ধভাবে তারা বাস করত। বর্তমান মানুষের আকার-আকৃতির সাথে তাদের বহুলাংশে মিল ছিল।

প্রশ্ন ঃ পশু শ্রেণীর মানুষের প্রজাতি কি এখনও পৃথিবীতে আছে?

উত্তর ঃ আল কোরআনের বক্তব্য অনুসারে বুঝা যায় মানব প্রজাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে রূপান্তর যেমন ঘটেছে তেমনি তাদের ক্ষেত্রে বিলুপ্তিও ঘটেছে। সাথে সাথে নতুন মানব প্রজাতি তাদের স্থান দখল করেছে। কিন্তু পশু শ্রেণীর মানুষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে কি না তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কারণ এখনও পার্বত্য এলাকার পাহাড়ে-জঙ্গলে কিছু কিছু উলঙ্গ-অসভ্য মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা সভ্য জগৎ থেকে সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্ন। এ ধরনের মানুষ আমাদের দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রুশ ককেশাস অঞ্চলের জাদ্দান পার্বত্য এলাকায় বসবাস করতে দেখা যায়। এরা আদিম পশু শ্রেণীর মানুষের বংশধর।

প্রশ্ন ঃ পশু শ্রেণীর মানুষের রূপান্তর ও বিলুপ্তি কি প্রক্রিয়ায় ঘটেছে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পশু শ্রেণীর মানুষের কিভাবে রূপান্তর ও বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন তা তিনিই ভাল জানেন। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং-এর গবেষণালব্ধ ধারণা থেকে বলতে পারি যে, Mutation প্রক্রিয়ায় এক জীব থেকে অন্য জীবের উদ্ভব ঘটেছে। অপর দিকে Genetic drift এর মাধ্যমে যে কোন প্রজাতির প্রজনন ক্ষেত্রে সহায়ক জিন উধাও হয়ে ঐ প্রজাতির চির দিনের জন্য বিলুপ্তি ঘটতে পারে।

প্রশ্ন ঃ জীব ও উদ্ভিদ কি বিবর্তনের মাধ্যমেই উন্নতর প্রজাতিতে রূপ নিয়েছে?

উত্তর ঃ বিবর্তন শব্দটা শুনলেই হয়ত আমরা মনে করি এটা ডারউইনের তথাকথিত বিবর্তনবাদ। মূলতঃ জীব ও উদ্ভিদ ডারউইনের বিবর্তনবাদের মাধ্যমে উন্নতর প্রজাতিতে রূপ নেয়নি। কারণ ডারউইনের বিবর্তনবাদ অদ্যাবধি কোন বিজ্ঞ জীব বিজ্ঞানীর মাধ্যমেও সঠিক বলে প্রমানিত হয়নি। তবে সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে একটা সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক বিবর্তন পদ্ধতি অবশ্যই চালু ছিল। কারণ আল কোরআনের বিভিন্ন আয়াতেও রয়েছে বিবর্তন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তবে এ বিবর্তন স্রষ্টার মহতী পরিকল্পনার মাধ্যমেই সংগঠিত হয়েছে। মূলতঃ জীব দেহের কাঠামোগত পরিবর্তন ও রূপান্তর স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তনের ফসল।

প্রশ্ন ঃ স্রষ্টার উদ্দেশ্য মূখী সাংগঠিক বিবর্তন পদ্ধতি নতুন উন্নতর প্রজাতির জীবের উদ্ভব ঘটেছে কি প্রক্রিয়ায়?

উত্তর ঃ পৃথিবীতে জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং ও আড় পরাগায়ণের মাধ্যমে

www.pathagar.com

উদ্ভিদের যেমন উদ্দেশ্য প্রণোদিত রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়েছে তেমনি জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং ও ক্লোনিং-এর মাধ্যমে জীবেরও উদ্দেশ্য প্রণোদিত রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়েছে। আড় পরাগায়ণ হলো পরোক্ষ পদ্ধতি। আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো প্রত্যক্ষভাবে একটি জীব বা উদ্ভিদ থেকে একটি জিনকে আলাদা করে অন্য একটি জীব বা উদ্ভিদের কোষে প্রবিষ্ট করিয়ে সমূদয় জীব বা উদ্ভিদকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা। এ ধরনের প্রযুক্তি মানুষেরই আবিষ্কার। মানুষ যেখানে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জীব বা উদ্ভিদের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে স্রষ্টার পক্ষে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটানো অসম্ভব কিছু নয় বরং তা স্রষ্টার পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার। স্রষ্টা যখনি পূর্বতন প্রজাতি থেকে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটাতে চেয়েছেন, তখন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার তিন নম্বর রীতি কাজে লাগিয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় যৌন প্রজনন রীতি বহির্ভূত পন্থায় পিতা ছাড়াই কোন না কোন মাতৃ-গর্ভে ডিম্বাণুর সাথে পরোক্ষভাবে উৎপন্ন শুক্রকীটকে নিষিক্ত করে ভ্রূণ রূপান্তরের মাধ্যমে পুরাতন প্রজাতির কাঠামো পরিবর্তন করে নতুনের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। এখানে পরোক্ষভাবে উৎপন্ন শুক্রাণুকীট কাদা মাটির সারভাগ থেকে স্রষ্টার নির্দেশেই উৎপন্ন হয়। এটি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মতই একটা প্রক্রিয়া। টেষ্ট টিউব বেবি বা জীবের ক্লোনিং এর ক্ষেত্রে যেমন জননযন্ত্র বা জরায়ুর প্রয়োজন তেমনি সৃষ্টিকর্তাও নতুন প্রজাতি উদ্ভব ঘটানোর সময় পুরাতন প্রজাতির নারীর জননযন্ত্র বা জরায়ু ডাইছ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মূলতঃ স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন পদ্ধতিটি অনেক ক্ষেত্রে এমনই মনে হয়। সম্ভবতঃ এ পদ্ধতিতে জিন রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্বতন প্রজাতির মানুষের জননযন্ত্র থেকে নতুন প্রজাতির আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আদমের (আ) আগে পৃথিবীতে পশু শ্রেণীর মানুষ যে ছিল তার প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ পৃথিবীতে আদমের আগেও যে নিম্ন ধাপের পশুর শ্রেণীর বর্বর

www.pathagar.com

মানুষের প্রজাতি ছিল, সেটি প্রমাণের উৎস হলো আল কোরআন; জীবাশ্ম বিজ্ঞান বা নৃ-বিজ্ঞান এবং জিন তথ্য ও দর্শন বিজ্ঞান।

মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কোরআনের কিছু সূরার বিভিন্ন আয়াতে পুরাতন মানব প্রজাতির বিলপ্তি এবং তাদের থেকে নতুন প্রজাতির মানুষের উদ্ভব ঘটানোর ইঙ্গিত রয়েছে। সেগুলো হলো সূরা দাহর ৭৬ : আয়াত ২৮ এবং সূরা আনআম ৬ : আয়াত ১৩৩।

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় আল্লাহ পৃথিবীতে খেলাফতের উপযোগী মানুষ পাঠানোর জন্য মহা সাংগঠনিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে মানব প্রজাতির দেহাবয়বগত কাঠামোর বার বার রূপান্তর পরিবর্তন ও সংশোধন করেছেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে পরম আত্মার আদম (আ) কে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীর দেহাবয়বগত বাহন দিয়ে মাটির ভুবনে প্রেরণ করলেন। সৃষ্টিকর্তা আদম (আ)-এর দেহাবয়বগত এই বাহন পৃথিবীর পশু শ্রেণীর মানব প্রজাতির বংশধর থেকেই যে উদ্ভব ঘটিয়েছেন তার সাক্ষী হলো আল কোরআন। এ বইয়ের বিভিন্ন স্থানে কোরআনের ঐ আয়াতগুলোর উল্লেখ রয়েছে। অপর দিকে সূরা বাকারার কয়েকটি আয়াতের (৩০ : ৩৭) বক্তব্যে ফেরেশতাগণের পূর্ব অভিজ্ঞতার ধারণা থেকেও আদমের আগেও যে পশু শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব ছিল তার সন্ধান মেলে। আমি পুর্বেও উল্লেখ করেছি যে, ফেরেশতাগণ পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই কথা বলে থাকে, তাই আল্লাহ যখন পৃথিবীতে খলিফা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেরেশতাগণকে অবহিত করলেন তখন তারা পশু শ্রেণীর মানুষের দোষ-গুণ বর্ণনা করলেন। আল কোরআনের সূরা বাকারার কয়েকটি আয়াত থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, আদমের আগেও পৃথিবীতে বর্বর পশু শ্রেণীর মানুষ ছিল।

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে আধুনিক জীবাশ্ম বিজ্ঞানীগণ মাটির নীচের অতি প্রাচীন কালের মানুষের ক্ষয়প্রাপ্ত হাড়ের কঙ্কালের নমূনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ পেয়েছেন যে, আদমের আগেও পৃথিবীতে

www.pathagar.com

মানুষের অনেক প্রজাতি ছিল। সেগুলোর মধ্যে যথাক্রমে প্রাইমেট, হোমোহ্যাবিলাস, হোমো ইরেকটাস, হোমো স্যাপিয়ানস ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে প্রাইমেট প্রজাতি ছিল বানরের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমানের। আবার হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের মানুষ ছিল বর্তমান মানুষের চেয়ে কম বুদ্ধিমানের। তবে আমাদের মতো আধুনিক মানুষের শারীরিক কাঠামোর সাথে তাদের দেহাবয়বগত গঠনের ছিল অনেক মিল। সে কারণে অনুমান করা হয় হোমো-স্যাপিয়ানস গোত্রের মানব প্রজাতির 'জিন' রূপান্তরের মাধ্যমে বর্তমান মানুষের আদি পিতা মাতার উদ্ভব হয়েছে। এখানে হোমো স্যাপিয়ানস শব্দের অর্থ-জ্ঞানী মানুষ। (হোমো-মানুষ, স্যাপিয়ানস-জ্ঞানী) এ জ্ঞানী মানুষের থেকেই উদ্ভব হয়েছে খেলাফতধারী মানুষের। জ্ঞানী মানুষের মস্তিষ্কের কোঠরের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১২০০ সিসি। অপরদিকে খেলাফতধারী মানুষের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ১৪০০-১৬০০ সিসি। জীবাশ্ম বিজ্ঞানের এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, আদমের (আ) আগেও পুথিবীতে পশু শ্রেণীর মানুষ ছিল।

প্রতিটি প্রজাতির বংশগতিরধারা বজায় থাকে জিনের মাধ্যমে। এ জিনের থাকে ডি.এন.এ. কোডে। যা বংশগতির ধারার তথ্য বহন করে। শারীরিক কাঠামো থেকে নিয়ে চারিত্রিক দোষগুণের তথ্য "জিনের" ডি.এন.এ. (DNA) কোড মওজুদ থাকে। পুরুষের শুক্রকীটের জিন ও নারীর ডিমাণুর জিন সংমিশ্রণের ফলে মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণ রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর আকার আকৃতি গঠিত হয়। এদের মধ্যে থাকে মা বাবার দেহগত ও চরিত্রের মিল। পৃথিবী জুড়ে মানুষে মানুষে চলছে রক্তারক্তি আর যুদ্ধবিগ্রহ। গোত্রে গোত্রে যেমন চলছে মারামারি কাটাকাটি তেমনি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চলছে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিহিংসার রোষানল। মানুষ তৈরী করছে মানুষকে মারার জন্য ভয়ানক আগ্নেয়াস্ত্র। মানুষের সংস্কৃতি চাল-চলন পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। মানবের চরিত্রের এসব গুণাগুণের উৎস কি? এর উত্তরে অবশ্যই বলা যায়, পশু শ্রেণীর মানুষের জিনের ডি.এন.এ. কোড বহন করে এনেছে এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আধুনিক মানুষের দেহে।

www.pathagar.com

আধুনিক মানুষ যে পশু শ্রেণীর মানুষের থেকে উদ্ভব হয়েছে, তার প্রমাণ দর্শন ও বিজ্ঞানের তথ্য নির্ভর যুক্তির মাধ্যমেও দেয়া সম্ভব। আমরা দেখে আসছি পশুর দেহ থাকে লোমে আবৃত। লোমযুক্ত পশুগুলো শীত নিবারণ করে লোম দিয়ে। আর লেজ দিয়ে পশুরা মশা-মাছি তাড়ায় এবং যৌনাঙ্গ ঢেকে রাখে। কিন্তু আধুনিক মানুষের শরীরে যে ধরনের লোম (যৌনাঙ্গের এরিয়া ব্যতীত) থাকে এর দ্বারা শীত নিবারণ করা কঠিন। তাই আধুনিক মানুষ কাপড় পরিধান করে। এর মাধ্যমে তারা শীত নিবারণ ও যৌনাঙ্গ ঢেকে রাখে। আদিম মানুষ কাপড় বুনতে জানত না। শীতের দিনে তারা পশুর চামড়া, গাছের ছাল এবং পাহাড়ের গুহায় বসবাস করে শীত নিবারণ করত। কিন্তু গরমের দিনে উলঙ্গই থাকত। তখন তাদের যৌনাঙ্গগুলো ঢেকে থাকত পিউবিছ হেয়ার (Pubis hair) দিয়ে। সমস্ত শরীরের চুল ছোট থাকলেও যৌনাঙ্গের চারপাশের চুলগুলো থাকত লম্বা। এতে সহজে যৌনাঙ্গগুলো ঢেকে থাকত।

বর্তমান মানব প্রজাতি পশু শ্রেণীর মানুষ থেকে উদ্ভব হয়েছে বলেই এখনও আমাদের গোপ্তাঙ্গের চুলগুলো লম্বা হয়। এই চুলগুলো পশু শ্রেণীর উলঙ্গ মানুষের প্রয়োজন থাকলেও বর্তমান মানুষের কোন প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে বরং যৌনাঙ্গের চুলগুলো একটা বাড়তি ঝামেলা। কিন্তু পশু শ্রেণীর মানুষের 'জিন' থেকে যেহেতু উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের মাঝেও এ 'জিন' চলে এসেছে তাই এই অবাঞ্ছিত চুলগুলো থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। এসব তথ্যের আলোকে বলা যায় আদমের আগেও পৃথিবীতে পশু শ্রেণীর মানুষ ছিল।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন পৃথিবীতে খলিফা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তখন ফেরেশতাগণকে কেন অবহিত করেছিলেন? এর মূল কারণ হলো, পূর্বে যে পশু শ্রেণীর মানুষ-পৃথিবীতে ছিল তাদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ছিল ফেরেশতাদের। তাই খেলাফতধারী মানুষের উপর থেকে ফেরেশতাগণের কর্তৃত্ব রহিত করার জন্যই তাদেরকে অবহিত

www.pathagar.com

করলেন। এ সব সূত্র থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, আদমের আগেও পৃথিবীতে নিম্ন ধাপের পশুর শ্রেণীর মানুষের প্রজাতি ছিল।

প্রশ্ন ঃ আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, এ কথাই স্বীকৃত, তাহলে তাঁরা মাতৃগর্ভে জন্ম নেয় কি করে?

উত্তর ঃ এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেয়া হল-সেটি এরূপ, একটা অত্যাধুনিক রিমোট কন্ট্রোল গাড়ী কোন এক কারখানায় তৈরী করা হয়েছে। তাতে তৈল, মবিল সব কিছু মওজুদ আছে এবং সুইচও দেয়া আছে। কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটার মালিকের হাতে। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত রিমোট কন্ট্রেল ট্রান্সমিটারের সুইচে টিপ না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত গাড়ীটি চলবে না এটাই সত্য। অতঃপর যখন গাড়ী তৈরী সমাপ্ত হয়ে যায় তখন গাড়ীর মালিক রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারের সুইচ টিপলে তখন গাড়ীটি সচল হবে এটাই স্বাভাবিক।

আশ্চার্যের ব্যাপার রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারের সুইচে টিপ দেয়ার পর গাড়ী চলতে থাকলেও এটি থেকে যে জিনিস বের হলো তা কিন্তু দেখা গেল না। মূলতঃ সে জিনিসটি না দেখা গেলেও, এ থেকে যে কোন একটা কিছু বের হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। সে জিনিসটি কি? মূলতঃ যে জিনিসটি বের হলো তাকে বলা হয় ইলেকট্রো ম্যাগনেটিভ ওয়েভ" (তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ)। এটাই গাড়ীটার প্রাণ বা জীবনি শক্তি বা চালিত শক্তি। এটা রিসিভ করেছে গাড়ী ভেতরের "রিমোট কন্ট্রোলে রিসিভার"। এটা না হলে যুগ যুগ ধরে গাড়ীটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তেমনি আদম ও বিবি হাওয়ার দেহ গাড়ী পৃথিবীর কোন না কোন ডাইছে, মাতৃথলির ডাইছে (জননযন্ত্রে) জন্ম হলেও প্রাণ বা জীবনি শক্তি প্রেরিত হয় বেহেশত থেকেই। কার্যতঃ এ জীবনি শক্তিই দেহ গাড়ীর মূল সত্তা। এ জীবনি শক্তি চলে গেলেই দেহ গাড়ী অচল হয়ে পড়ে। তখন আর সেটিকে ঠেলেও সচল করা যাবে না। সে অর্থে আদম ও বিবি হাওয়ার দেহ গাড়ী পৃথিবীতেই তৈরী হয়। আর প্রাণ বা জীবনি শক্তি প্রেরিত হয় বেহেশত থেকেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ এক আত্মা থেকে তার সঙ্গীনি এবং তাদের মাধ্যমে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া হলো। দুনিয়ার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্ভব?

উত্তর ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের ডিম্বাশয় (Ovarys) থেকে দু'টি ডিম্বাণু (Ovum) বের হয়ে সেগুলো যদি পুরুষের শুক্রকীটের মাধ্যমে নিসিক্ত হয়ে দু'টি ভ্রুণ সৃষ্টির মাধ্যমে মায়ের জননযন্ত্রে (Uterus) প্রোথিত হয়, তবে এ প্রক্রিয়ায় সেখান থেকে দু'টি সন্তান হতে পারে। কিন্তু এখানে এক আত্মা বা একটি মাত্র জীবকোষের মাধ্যমে দু'টি সন্তান জন্ম হয়নি। আবার দ্বিতীয় আর একটি প্রক্রিয়া হলো-নারীর একটি ডিম্বাণুর সাথে ঘটনাক্রমে দু'টি ভ্রূণে বিভক্ত হয়েও দু'টি সন্তান হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও এক আত্মা বা একটি মাত্র জীবকোষের (শুক্রকীট) থেকে দু'টি সন্তান হয়নি। অপরদিকে তৃতীয় আর একটি প্রক্রিয়া হলো-একটি মাত্র জীবকোষ বা একটি শুক্রকীটের মাধ্যমে নারীর একটি ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে স্রষ্টার নির্দেশে ঘটনাক্রমে বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে (Positive Information bit বা ধ্বনাত্মক তথ্যকণার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে) সেটি দু'টি ভ্রুণে পরিণত হয়ে দু'টি সন্তান জন্ম হতে পারে। এটিই হলো দুনিয়ার ক্ষেত্রে এক আত্মা বা একটি মাত্র জীবকোষ (শুক্রকীট) থেকে তার সঙ্গীনী পয়দা হওয়ার মূল প্রক্রিয়া। অতঃপর তাদের মাধ্যমেই পরবর্তিতে প্রজনন রীতিতে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি হয়ে দুনিয়ায় ছড়িয়ে যায়।

অতঃপর পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি যেন না ঘটে সে দিক চিন্তা করে সম্ভাব্য প্রশ্ন-উত্তর পর্বের এখানেই ইতি টানা হলো। পরবর্তি পর্যায়ে সংস্করণ করা হলে সরাসরি পাঠকের প্রশ্নোত্তর সংযোগ করে ছাপানোর আশা রাখি। তাই পাঠক মহলের কাছ থেকে আদম ও হাওয়ার আদি উৎস, দুনিয়ায় আগমন ইত্যাদির সম্পর্কে আমার দেয়া তথ্যের সাথে কারও দ্বিমত থাকলে সরাসরি আমার কাছে প্রশ্ন করতে পারেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তরসহ নতুন সংস্করণ বের করব এটাই আমার অঙ্গীকার।

www.pathagar.com

আল্লাহর আদি অবস্থান

অনেক মানুষ এভাবে চিন্তা করে যে দুনিয়ার সকল কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? কিংবা আল্লাহর আগে কি ছিল? এর জবাবে বলা যায়, আল্লাহই জগতের আদি ও চিরন্তন সত্তা। তিনি কারও মাধ্যমে সৃষ্টি হন নাই। আমরা যদি কাউকে প্রশ্ন করি একশত এর আগের সংখ্যাটি কি? তখন একশত থেকে এক বাদ দিয়ে (১০০-১=৯৯) বলতে পারব সে সংখ্যাটি হবে নিরানব্বই। এভাবে পিছনের দিকে আসতে থাকলে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে আদি মূল একক 'এক'কে। কিন্তু তারও আগে কি ছিল এরূপ চিন্তা করলে পাওয়া যাবে শূন্যের (০) অস্তিত্ব। মূলত শূন্য মূল্যহীন। এ থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। তাই আল্লাহ জগতের এক ও চিরন্তন সত্তা। আল্লাহ শূন্য (০) থেকে সৃষ্টি হননি। বরং তিনি শূন্য থেকেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর আগে, পরে, উপরে, নীচে বলতে কিছুই নেই। পরম স্থিতির জগতে আল্লাহ ব্যতীত জগতের সর্বত্রই ছিল শূন্যতা।

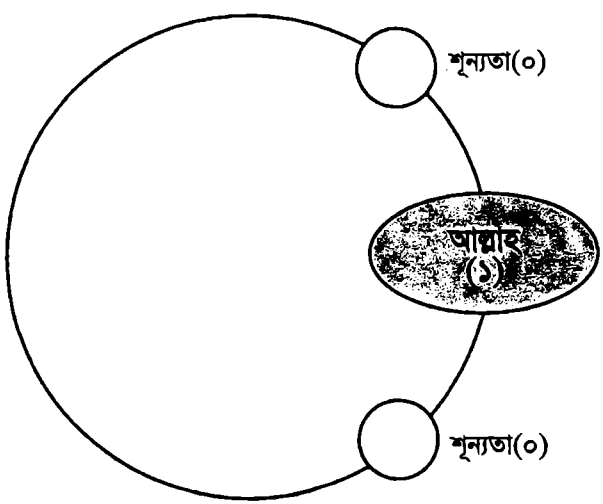

www.pathagar.com

একটা বৃত্তের পরিধির এক জায়গায় যদি আল্লাহর অস্তিত্ব ধরে নেই, তাহলে দেখা যাবে, এখানে আল্লাহর আগে, পরে বলতে কিছু নেই। এক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া সর্বদিকেই শূন্যের অবস্থান। তাই শূন্য (০) যেমন আল্লাহকে বানায়নি, তেমনি আল্লাহর আগে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিলনা। তিনি জগতের আদি, একক সত্তা। মূলত আল্লাহর আদি অবস্থান সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারলেই আমাদের মন থেকে এ ধরনের চিন্তার অবসান ঘটতে পারে।

মানুষ ক্ষণস্থায়ী জীব। দুনিয়ার জীবনে তাদের শুরু এবং শেষ আছে। কিন্তু আল্লাহ অনন্ত, অসীম, চিরঞ্জীব। তাই মানুষের পক্ষে আল্লাহর আদি অবস্থান সম্পর্কে জানা তাদের জ্ঞানের পরিসীমার আওতাধীন নয়। এখানে "আল্লাহর আদি অবস্থান" বলতে পরমস্থিতির জগতে আল্লাহ কোথায়, কিভাবে ছিলেন এবং তখন মহাবিশ্বের অবস্থা কেমন ছিল, সে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। মূলত আল্লাহ আদিতেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনিই আছেন। আল্লাহর ক্ষেত্রে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, এ ধরনের বাক্য ব্যবহারের প্রশ্নই আসে না। আল্লাহর বেলায় বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই। তবে শুরু থেকেই মহাবিশ্বের আদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। অর্থাৎ এক সময় মহাবিশ্বে ছিল পরম স্থিতি অবস্থা এবং বর্তমানে রয়েছে আপেক্ষিক গতি। পরমস্থিতি অবস্থায় কোথাও পদার্থ বলতে কিছুই ছিলনা। কিন্তু আপেক্ষিক গতি অবস্থায় আমরা এখন মহাবিশ্বে যা কিছু দেখছি, তার সকল কিছুই ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হচ্ছে। আল্লাহ মহাবিশ্বের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজের কার্যব্যবস্থা ও আসনের পরিবর্তন করেছেন সত্য, কিন্তু তিনি আগেও যেমন ছিলেন এখনও তেমনি আছেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ নিজের আদি অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

"আমি ছিলাম একটি গুপ্তধন। আমি প্রকাশ হতে চাইলাম, তাই সৃষ্টি করলাম এই সৃষ্টিকে। ইচ্ছা আমি পরিচিত হই।" (হাদীসে কুদসী)

কোরআন মাজীদে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- "তিনিই আদি ও তিনিই অন্ত; তিনি ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত।" (৬ : ১০৩)

পরম স্থিতি অবস্থায় মহাবিশ্বে ছিল পরম নির্ব্যূঢ় শূন্যতা। তখন সময়ের

www.pathagar.com

চাকা ছিল স্থির। সেই পরম শূন্য সময়ে বস্তুকণা, কোয়ার্ক, কসমিক ব্যাক গ্রাউন্ড মাইক্রো-ওয়েভ সহ কোন কিছুই ছিল না। এমন শূন্য সময়ে যেমন ছিল না পদার্থের কোন অস্তিত্ব তেমনি ছিল না স্থান কালের সম্পর্ক। সে সময় পরম প্রতিপালক ছিলেন মহাজগতের গুপ্তধন।

তিনি ছিলেন পরম শূন্যতার মাঝেই গুপ্ত। অনন্ত শূন্যতা থেকে স্রষ্টা প্রকাশ হতে চাইলেন। তাই সৃষ্টার প্রকাশের ব্যগ্রতা পরম স্থির অসীম শূন্যতাকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে স্পন্দিত করে। এ স্পন্দন মহামনের (স্রষ্টার) পরম ইচ্ছার প্রকাশ "মহাস্পন্দন"। যা পরম স্থিরতা বা শূন্যতাকে আন্দোলিত করে তোলে। এ আন্দোলন পরম শূন্যতার মাঝে ঢেউ বয়ে তোলে। এ থেকে পরম শূন্যস্থান তরঙ্গ বা ঢেউ চলার গুণ লাভ করে। তাই মহা বিশ্বের শুরুটা পরম সত্তার ইচ্ছার বহিপ্রকাশ। এর ফলে শক্তি ও বস্তুর মূল সত্তার প্রকাশ হয়। বস্তুর মূল সত্তা হলো তথ্য কণা। এর থেকেই ফোটন বা আলোর উদ্ভব হয়। তারপর কোয়ার্ক এর আবির্ভাব। অতঃপর কোয়ার্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এ থেকেই বস্তু জগতের উৎপত্তি।

ষ্টিফেন হকিং একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী। তার মতে আদিম মহাবিস্ফোরণের পর থেকে এই বিশ্ব জগতের উৎপত্তি। তিনি সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টার হাত আছে এ কথা বিশ্বাস করতে নারাজ। তারা মহাবিশ্বের শুরুটাকে দ্বৈবিক মনে করেন। তাদের ধারণা আদি ব্ল্যাক হোল (কৃষ্ণ গহ্বর) থেকে এখনও মাইক্রোওয়েভ উৎসারিত বা বিকিরিত হয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে ব্ল্যাক হোলেরও বিলুপ্তি ঘটবে। এ অর্থে আদি ব্ল্যাকহোল হল-আদিম মহাবিস্ফোরণ ক্ষেত্র। তারা কখনো মনে করেন না যে, সৃষ্টির আদি উপাদানেরও স্রষ্টা আল্লাহ নিজেই।

কিন্তু আমরা কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি থেকে মহাবিশ্বের শুরু বা আরম্ভের আগেও আল্লাহ কি অবস্থায় ছিলেন তা জানতে পেরেছি। আমরা জানলাম আদিতে মহাবিশ্বের পরম স্থিতি ও শূন্য সময়ে আল্লাহ ছিলেন পরম শূন্যতার মাঝে গুপ্ত অবস্থায় এবং তিনিই ছিলেন জগতের গুপ্তধন। জগৎ সৃষ্টির করার ক্ষেত্রে স্রষ্টা এর মাল-মসলা অন্য কোথাও হতে আমদানী করেননি। সে জন্য আল্লাহ বস্তু ও বস্তুর উপাদানের স্রষ্টা। তিনি শূন্য থেকে

www.pathagar.com

বস্তুর উপাদান ও বস্তু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির শুরুর ক্ষেত্রে স্রষ্টার ইচ্ছা বা আদেশ ঘটিত স্পন্দন বা তথ্য কণাই মূল উপাদান।

আল কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেছেন- "তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা।" (৪২ : ১১)

"আমি যে জিনিসের এরাদা করি সে জন্য শুধু এতটুকু বলতে হয় "হয়ে যাও" তাহলেই তা হয়ে যায়।" (সূরা নাহল : ৪০)

আল্লাহই সকল সৃষ্টির আরম্ভ করেছেন; তারপর তা পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেছেন এবং সবশেষে সবাইকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।" (১৭ : ৫০-৫৩)

আল্লাহর আদেশ ("হয়ে যাও") ঘটিত ইচ্ছা (এরাদা) হলো তথ্য কণা। বস্তু জগতের সমুদয় কিছুই তথ্য কণার সমাহার। তথ্য সাধারণতঃ জীবন ঘনিষ্ঠ কোন মাধ্যম থেকেই প্রেরিত হয়। তাই জগতের সকল শক্তির উৎস একমাত্র আল্লাহই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের আদি ব্ল্যাকহোল থেকে কসমিক ব্যাক গ্রাউন্ড মাইক্রো ওয়েভ উৎসারিত হওয়ার ধারণাটি ভ্রান্ত। এ অর্থে মহাবিশ্বের শুরুর ক্ষেত্রটা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়েছে এটা বিশ্বাস করা ঠিক নয়। মহাবিশ্বে ব্ল্যাকহোল আছে, থাকতে পারে। কিন্তু বিশ্বের আদি শুরুটা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়েছে, এটা সত্য নয়। বরং বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বের শুরুটা ব্রাইট হোল(উজ্জ্বল গহবর)-এ অবস্থানকারী পরম সত্তার প্রেরিত 'তথ্য কণার' মাধ্যমেই হয়েছে। সেই ব্রাইট হোলের উজ্জলতায় তার আশে পাশের কোটি কোটি আলোক বর্ষ দূরত্বের মাঝে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। হাদীসে কুদসী থেকে এর কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"যখন জান্নাতের অধিবাসীগণ জান্নাতের নিয়ামতসমূহ উপভোগরত থাকবে, তখন তাদের জন্য একটি আলো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের মস্তক উত্তোলন করবে এবং অনুভব করবে যে, তাদের প্রভু উপর হতে তাদের উপর স্বীয় উপস্থিতির আলোকপাত করেছেন। অতঃপর তিনি বলবেন, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক, হে জান্নাতবাসীগণ!' ইহা আল্লাহ তা'আলার সেই বাণী (যা কুরআনে উল্লেখ আছে) "শান্তি উক্তিটি দয়াময় প্রভুর পক্ষ হতে" (সূরা ইয়াসীন : ৫৮)। তিনি জান্নাতবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। তারাও তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। অতঃপর যতক্ষণ তারা তাঁকে দেখতে থাকবে, ততক্ষণ তারা

www.pathagar.com

জান্নাতের কোন নিয়ামতের দিকেই লক্ষ্য করবে না। অতঃপর তিনি তাদের নিকট হতে আত্মগোপন করবেন। শুধু তাঁর আলো ও তাঁর বরকত তাহাদের উপর এবং তাদের বাসভবন সমূহের উপর অবশিষ্ট থাকবে।" (হাদীসে কুদসী)

পরম স্থিতির জগতে আল্লাহ যেমন নিরাকার অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছিলেন এখনও আল্লাহ তেমনই আছেন। কারণ নিরাকার অস্তিত্ব ব্যতীত কেউ অনন্ত, অসীম ও চিরঞ্জীব হতে পারে না। যার আকার আছে তার একটা সীমানা থাকে এবং তার মাঝে গতি বিরাজ করে। এ কারণে সেটি সীমাবদ্ধ, সসীম ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের অধিকারী হয়। যেমন একটি টেবিল কিংবা আকাশের চাঁদ উভয়ের গঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীমানা থাকে। এদের সাথে বড়, ছোট হিসেবে অন্যদের তুলনা করা যায়। এগুলো চৌমাত্রিকের মধ্যে বিরাজ করে। এদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং সময়ের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে গতি আছে। ফলে তাদের জন্ম ও মৃত্যু আছে। কিন্তু পরম স্রষ্টা মাত্রা বহির্ভূত জগতে অবস্থান করেন বলে তিনি চিরঞ্জীব অনন্ত, অসীম ও মাত্রাহীন। তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মৃত্যুর বালাই নেই এবং আল্লাহর অবস্থানের ক্ষেত্রে গতি ও সময়ের কোন অস্তিত্ব নেই।

আমরা তিন মাত্রার জীবকে ধরতে, ছুঁইতে পারি, কিন্তু দুই মাত্রার জীব হলে সেটি হবে কাগজে ছাপানো ছবির ন্যায়। এমন প্রাণী চলতে ফিরতে পারবে না। তাদের পরিপাক তন্ত্রের ঝামেলা থাকবে না। তাই তাদের খাদ্য হজম হবে না। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে মৃত্যুই অবধারিত। আর এক মাত্রার জীবের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। পদার্থের জগতে শুধু দৈর্ঘ্য আছে এমন জীব হতেই পারে না। সুতরাং অস্তিত্বশীল আকার, আকৃতির জীব মানেই মাত্রিক জিনিস।

তাই জগৎ স্রষ্টার ক্ষেত্রে কোন মাত্রা নেই, আকার নেই, গতি নেই। তিনি নিরাকার, তবু বেহেশতবাসীগণ স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পাবেন। আল্লাহকে দেখার বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে বুঝানো খুব কঠিন। তাঁর সাথে কারও তুলনা চলে না। তবু বলা যায় আসমান নিরাকার হলেও সেটি যেমন সামিয়ানার মতো দেখা যায়, তেমনি আল্লাহ নিরাকার হলেও তাঁকে দেখা যাবে।

www.pathagar.com

নিম্নে হাদীসে কুদসী থেকে এ সম্পর্কে উদাহরণ দেয়া যায়–

"দিনে যখন আকাশে মেঘ থাকে না তখন তোমরা সূর্য দেখ কি? আর রাতে যখন আকাশ মেঘ মুক্ত থাকে, তখন তোমরা চাঁদ দেখকি? নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রভুকে অতিসত্ত্বর দেখতে পাবে। এমন কি কোন ব্যক্তিকে তার প্রভু সম্বোধন করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন, "হে আমার বান্দা! তুমি কি এই গুনাহ স্বীকার কর?" সে বলবে, "হে আমার প্রভু! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেন নাই?" তখন তিনি বলবেন, "আমার ক্ষমার ফলেই তো তুমি এই পর্যায়ে পৌঁছেছ।" (হাদীসে কুদসী)

আদিতে আল্লাহ ছিলেন পরম শূন্যতার মাঝে গুপ্ত অবস্থায়। অতঃপর আল্লাহ আরশকে নিজ আধিপত্যের অধীনে আনলেন। এতে জগৎ -মহাজগতের সকল কাজ-কর্ম সুচারুরূপে চলতে থাকে।

"তৎপর আ'রশকে আল্লাহ নিজ আধিপত্যের অধীনে করলে জাগতিক কার্যবলী সুচারুরূপে চলতে লাগল।" (আল কোরআন)

পৃথিবী ঘুরছে। ঘুরছে আসমানের গ্রহ নক্ষত্রগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে। এটাই গতির জগৎ। এদের মাঝে গতি আছে বলেই সেগুলো টিকে আছে শূন্যের মধ্যে। তাই গতির জগতের পাশাপাশি স্থিতি (স্থির) জগৎ ও রয়েছে। স্রষ্টা আগেও যেমন ছিলেন পরম স্থিতির জগতে তেমনি এখনও রয়েছেন গতিহীন পরম স্থির জগতে। সেখান থেকেই তিনি আ'রশের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আল্লাহর ক্ষমতা সৃষ্টির প্রতিটি রেনু কণা পর্যন্ত বিস্তৃত। আল্লাহর আ'রশ মহামস্তিষ্ক। এর স্নায়ু ব্যবস্থা অদৃশ্য। তাই স্রষ্টার কার্যক্রম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা শুধু অনুভব করি। আল্লাহ আছেন বলেই জগৎ টিকে আছে। তাঁর কুদরতের হাতে জগতের সকল কিছুই বন্দি। আমরাও তাঁর সৃষ্টির বাইরে নই। তাই আমাদের উচিত স্রষ্টার আনুগত্য করা।

www.pathagar.com

রূহ বা আত্মার পরিচয়

রূহ বা আত্মা কি? তার উত্তর পাওয়া খুব কঠিন। সহজ অর্থে রূহ বা আত্মা হলো জীবনী শক্তি। একে দেখা যায় না। ছোঁয়া যায় না। তার রং রূপ গঠন কিছুই বর্ণনা দেয়ার মত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা)কে যখন কাফেররা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে (সা) বললেন-'বলুন, রূহ আমার নির্দেশ'।

"আর লোকে আপনাকে আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুন, আত্মা আমার প্রভুর হুকুম।" (আল-কোরআন)

রূহ এবং জড়দেহ দুই জগতের দুই সত্তা। পরম করুণাময় আল্লাহর নির্দেশে দুই জগতের দুই সত্তা দুনিয়ার মতো দ্বীপ রাজ্যে একত্রে বসবাস করে। রূহ চলে গেলে জড়দেহের অস্তিত্ববিলীন হয়ে যায়। কারণ রূহ চলে গেলে জড়দেহকে যতই খাবার-দাবার দেয়া হোক না কেন সেটি আর কোন কিছুই গ্রহণ করে না। দুনিয়ার সকল লোভ লালসা ত্যাগ করে সেটি চির নিদ্রায় চলে যায়। তাই দেহ এবং আত্মার মধ্যে আত্মাই হলো আসল সত্তা। এর ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই, একে ভাগ করা যায় না এবং পরিমাপ করা যায় না। আমরা জগতের সকল কিছুর পরিচয় জানলেও নিজ দেহের আসল সত্তার পরিচয় জানি না। কল্পনায়ও তার পরিচয় তালাশ করি না। তবে এ কথা সত্য যে, রূহের পরিচয় পাওয়া ও হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন। তাই এ ব্যাপারে শরিয়তে ব্যাপক জানার চেষ্টা করাও নিষেধ আছে। আত্মা ও জড়দেহ একত্রে বাস করলেও তাদের জন্ম স্থান দুই ভিন্ন রাজ্যে। যেমন রূহ বা আত্মা রূহানী জগৎ বা আলমে আমরের সৃষ্টি আর জড়দেহ আলমে খালক-এর জগতের বস্তুর উপাদান দিয়ে গঠিত। আলমে খালক-এর জগতের বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আছে। একে ভাগ করা যায়, পরিমাপ করা যায়। কিন্তু আলমে আমরের সত্তাকে ভাগ করা যায় না। এর আকার নেই। এর বিনাশ বা ধ্বংস নেই। সে হিসেবে মানুষের রয়েছে দু'ধরনের আত্মা। যেমন একটি জীবাত্মা এবং অপরটি পরমাত্মা। জীবাত্মা পশুদেরও

www.pathagar.com

আছে। এ ধরনের আত্মার স্রষ্টাকে চেনা-জানার মতো শক্তি নেই। কিন্তু পরমাত্মা স্রষ্টাকে তালাশ করে এবং তাঁর আনুগত্যশীল হয়। তবে যাদের পরমাত্মা দুনিয়ার মোহে অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে তাদের দ্বারা স্রষ্টার আনুগত্যের কাজ হয় না। এ ক্ষেত্রে জীবাত্মাই তাদের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ তখন পরমাত্তা বন্দিশালায় বসে থেকে জীবাত্মার খায়েশ মত দেহকে পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে পরমাত্মা প্রতিনিধির দায়িত্ব ভুলে যায়।

"তা নয় বরং নিজ কর্মের দোষে তাদের আত্মার উপর মরিচা পড়েছে।" (আল কোরআন)

এ পর্যায়ে এসে আবার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে দুই জগতের দুই সত্তা একত্রে মিলিত হলো কি করে? এ বিষয়টি বুঝানোর জন্য জীব দেহকে একটি রিমোট কন্ট্রোল গাড়ীর সাথে তুলনা করে একটি রূপক উদাহরণ দেয়া হল। যেমন, একটি রিমোট কন্ট্রোল গাড়ী মালিকের নির্দেশে শ্রমিকরা কারখানায় তৈরী করল। কিন্তু ঐ গাড়ীর রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারটি মালিকের হাতে। নির্মাণ ব্যবস্থাপনা যখন পরিপূর্ণ করা হলো তখন গাড়ীটি রাস্তায় চলার জন্য রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারের সুইচ-এ চাপ দেয়া হলো। এতে রাস্তায় গাড়িটি চলতে লাগল। তুলনামূলকভাবে আমাদের দেহ গাড়ী (জড়দেহ) মাতৃথলিতে পরিপূর্ণভাবে নির্মাণ হলে, এটিকে জ্ঞান ও শক্তিতে পূর্ণ করে সচল করার জন্য সৃষ্টিকর্তা কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারের সুইচ চাপলেন। সাথে সাথে দেহ গাড়ী সচল হয়ে চলতে শুরু করে। এবারও প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারের সুইচে চাপ দেয়ার পর গাড়ীটি চলল যে শক্তির সাহায্যে, তা কি জিনিস? মূলত: রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটার থেকে যে সংকেত (নির্দেশ) বের হয়. তা আমাদের চোখের সম্মুখে দিয়ে আসলেও আমরা তাকে দেখতে পারি না। কার্যতঃ ঐ যন্ত্রটি থেকে যে নির্দেশটি যায় বিজ্ঞানের ভাষায় তা হলো "তরিৎ চুম্বক তরঙ্গ" বা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিভ ওয়েভ। অপর দিকে মূল গাড়ীতে এ ধরনের সংকেত ধারণ করার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ সেখানে থাকে রিমোট কন্ট্রোল রিসিভার। এটি ঐ সংকেত বা নির্দেশটি ধারণ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ ধরনের তড়িত-চুম্বক তরঙ্গ

www.pathagar.com

রিমোট কন্ট্রোল গাড়ীর জীবনী শক্তি। যার হাতে ঐ গাড়ীর ট্রান্সমিটারটি থাকে তিনি ইচ্ছা করলে সুইচ অফ করে তা অচল করে দিতে পারেন। অথবা যখন গাড়ীর যন্ত্রাংশসহ তৈল, মবিল কমে যায় তখন যদি সেটি অচল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তখনও ট্রান্সমিটারের সুইচ অফ করে তা বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সুনিয়ন্ত্রিত কৌশলের মাধ্যমে রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটার"-এর সুইচ অফ করে মানুষের দেহ গাড়ী অচল করে দিয়ে থাকেন।

এ পর্যায়ে এসে বুঝতে হবে যে, রূহ বা আত্মা হলো আল্লাহর নির্দেশ। যা তড়িৎ চুম্বক-তরঙ্গের ন্যায় এক ধরনের জীবনী শক্তি। এ শক্তি " রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটার" (বিজ্ঞানের ভাষায়) থেকে তড়িৎ চুম্বক-তরঙ্গের ন্যায় শূন্য মাধ্যম দিয়ে উড়ে এসে মানুষের "কলব"-বা রিমোট কন্ট্রোল রিসিভারকে সচল করে। এ ধরনের জীবনী শক্তি বা রূহ হলো-"চুম্বক তথ্য তরঙ্গ"। তবে এ সত্তাতে বিশেষ বিশেষ কিছু গুণ সংযোগ করে দেয়া হয়েছে। জড়দেহের ডি. এন. এ. কোড যেমন পূর্ব পুরুষের দৈহিক ও চারিত্রিক গুণাগুণ নুতন প্রজন্মে নিয়ে আসে, তেমনি লাইফ কোডে বা "চুম্বক তথ্য তরঙ্গ" বিশেষ কিছু গুণ স্রষ্টার পক্ষ থেকেই সংযোগ করে দেয়া হয়েছে। মূলতঃ গুণ বা চরিত্র অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত হয়। তাই আদম ও হাওয়াকে (আত্মিক পর্যায়ে) শয়তান সম্পর্কে অবহিত করতে একটি মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে রূহ সম্পর্কে বুঝতে কষ্ট না হওয়ারই কথা। কারণ তড়িৎ চুম্বক-তরঙ্গ সম্পর্কে বিজ্ঞানমনা সকল মানুষের কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে। মানুষ চৌমাত্রিক জগতে বাস করে বলে মাত্রা জ্ঞানের বাইরের কোন অদৃশ্য বস্তু যে এতো ক্ষমতা রাখতে পারে সে আন্দাজ করতে পারে না। তবে তড়িৎ চুম্বক-তরঙ্গ যে রূহ তা নয়, এটি সমপর্যায়ের একটি উদাহরণ মাত্র।

এ জগতের সকল বস্তুই তরঙ্গের আধার। আমরা যা কিছু খাই, যার উপর দিয়ে চলি, সকল কিছুই তরঙ্গ আর তরঙ্গ। বস্তুর সার নির্যাস হলো কোয়ান্টা বা তরঙ্গ ঝাঁক। অর্থাৎ তরঙ্গ বা শক্তির ঘণীভূত অবস্থাই পদার্থ।

www.pathagar.com

আবার পদার্থসহ সকল কিছুই তথ্য কণার জমাট বদ্ধ রূপ। সে অর্থে রূহ হলো "আদেশ তথ্য কাটামো" (Command Information bit)। সব মিলে পৃথিবীর কোন বস্তুর অভ্যন্তর খালি বা শূন্য থাকে না। কারণ শক্তির পাশাপাশি থাকে বিভিন্ন ধরনের বল। অপর দিকে কোন কণাই পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে না। তাদের মধ্যে থাকে আন্ত-আণবিক ফাঁক। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহের আন্ত-আণবিক ফাঁক বন্ধ করতে পারলে একটা বৃহৎ মানুষ একটা বিন্দুতে পরিণত হয়ে যাবে। তখন রূহ ও একটা জড় মানুষের মধ্যে খুব একটা বড় তফাৎ থাকবে না।

এ আলোচনা থেকে আমরা ধারণা নিতে পারি যে, রূহ হলো অবিনশ্বর জীবনী শক্তি। যা কোন দূর অতীতের অজানা জগৎ থেকে মানুষের দেহ রাজ্যে প্রবেশ করে সেটিকে সচল রাখে।

রূহ বা আত্মা একটি অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক সত্তা। একে ধরা যায় না, দেখা য়ায় না, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটারের প্রেরিত "তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ" যেমন রিমোট কন্ট্রোল রিসিভার ধারণ করে যন্ত্রটিকে সক্রিয় করে তেমনি স্রষ্টার Command Information bit মানবদেহকে জ্ঞানে ও শক্তিতে শক্তিশালী করে সতেজ রাখে। তাই আল্লাহ রাসূলকে (সা) বলেছেন, বলুন, "আত্মা আমার প্রভুর হুকুম।" (আল কোরআন)

আল্লাহ মানব আত্মার মধ্যে কিছু জ্ঞান বা তথ্য দিয়ে দিয়েছেন। দুনিয়াতে এসে অনেকেই দুনিয়ার মোহে সে তথ্যের খবর ভুলে যায়। ফলে তারা পরকালে নাজাতের পথ হারিয়ে ফেলে।

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নিষ্কলঙ্ক আত্মা নিয়ে আসবে সে ছাড়া অন্য কেউই নাজাত পাবে না।" (আল- কোরআন)

মানুষ কখনও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে না। তাই আত্মার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত। মানব দেহের মূল সত্তা হলো আত্মা। পরকালে আত্মারই বিচার হবে। তবে আত্মার বাহন বা প্রকাশ আবরণ 'জড়দেহ' বিচারের বাইরে থাকবে না। আত্মাকে তার বাহনের চড়িয়ে শাস্তি দেয়া হবে।

www.pathagar.com

রূহ বা আত্মার স্বভাব-প্রকৃতি চার ধরণের হয়ে থাকে। যেমন–১। পশুর স্বভাব ২। কুকুরের স্বভাব ৩। শয়তানের স্বভাব ৪। ফেরেশতার স্বভাব। যারা ফিরিশতার স্বভাবকে মানবিক মর্যাদায় উন্নিত করে অন্যান্য দোষগুলো বিসর্জন দিতে পারবে তারাই আখেরাতে ফিরিশতার রাজ্যে গমন করতে পারবে। তাই আদমের সন্তানগণ কিছু হবে জান্নাতী এবং কিছু হবে জাহান্নামী। নিম্নের হাদীসে কুদসীর বর্ণনাতেও এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদমের সন্তান-সন্ততিকে তাঁর পিঠ হতে বের করলেন, তারপর তাদেরকেই তাদের নিজের ব্যাপারে সাক্ষী করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" তারা বলল, "হাঁ"। তারপর তিনি তাদেরকে তাঁর দুই হাতের তালুতে সঞ্চালিত করলেন এবং বললেন, "এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর এরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তারপর জান্নাতবাসীদের জন্য তাদের আমল সহজ করে দেয়া হবে।" (হাদীসে কুদসী)

রূহ সম্পর্কে এটাই শেষ কথা নয়। মহান আল্লাহর অদৃশ্য সৃষ্টিগুলোর মধ্যে "রূহ" হলো অনুভবের জিনিস। তাই মানুষের পক্ষে রূহ সম্পর্কে বিশদ জানা ও ব্যাখ্যা করা তার সাধ্যের বাইরে। মহান আল্লাহই জানেন রূহের গঠন, রূপ, চরিত্র সম্পর্কে। আমরা শুধু অনুমানের উপর ভর করে আল্লাহর কুদরতের অসীম দরিয়ায় সাঁতারানোর চেষ্টা করছি।

www.pathagar.com

আদম (আ) সম্পর্কে ফিরিশতাদের অবহিত করার কারণ

"হে রাসূল (স্মরণ করুন) যখন আপনার রব ফিরিশাতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা পাঠাচ্ছি। তখন তারা বলল, আপনি কি এমন কাউকে নিয়োগ করতে চান, যে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং খুনাখুনি করবে? আমরাই তো আপনার তাসবীহ ও তাকদীস (পবিত্রতা) করছি। তখন আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" (সূরা বাকারা)

মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে মানুষকে খলিফা হিসেবে পাঠাবেন, এ সম্পর্কে ফিরিশতাদেরকে জানানোর কারণ কি? ফিরিশতাসহ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই যেখানে আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করেছেন, সেখানে মানুষকে খলিফা হিসেবে পাঠানোর পূর্বে ফিরিশতাদেরকে জানানোর মাঝে নিশ্চয় কোন গোপন রহস্য বিদ্যমান রয়েছে।

সৃষ্টি জগতের সমস্ত কাজের দায়িত্ব ফিরিশতারা পালন করে থাকে। ফিরিশতারা আল্লাহর আজ্ঞাবহ প্রহরী ও শ্রমিক। যখন যেখানে যে দায়িত্ব দিয়ে তাদের পাঠানো হয়, তৎক্ষণাৎ তারা তা পালন করে। তাই বিশ্ব মালিকের পক্ষ থেকে নতুন কোন শাসন ব্যবস্থার নীতি প্রবর্তন করার আগে ফিরিশতাদেরকে অবহিত করতে হয়।

জগতের কোন জীব আল্লাহর আনুগত্যের বিরোধীতা করতে পারে না। যখনি কোন জীব আল্লাহর আনুগত্যের বিরোধীতা করত তখন সাথে সাথে ফিরিশতারা তাদের ধড়পাকড় করে শায়েস্তা করত। জীব ও জগতের সাংগঠনিক বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে এ নীতিই চালু ছিল। ফলে ফিরিশতাদের স্রষ্টার এ নীতি সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত ছিল বলে, সেভাবেই দায়িত্ব পালন করত। অতঃপর যখন বিশ্ব শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্রষ্টা নিজেই নতুন কর্মনীতি চালু করার চিন্তা করলেন, তখন এ সম্পর্কে ফিরিশতদেরকে অবহিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়, কারণ নতুন এ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ফিরিশতাদের কোন ধারণা ছিল না।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে আদমকে খলিফা হিসেবে পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত যত জীব পৃথিবীতে বসবাস করছিল, তাদের মধ্যে কোন জীব প্রজাতির প্রাণীরই ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা ছিল না। কোন প্রাণীই অন্যায়, অবিচার করতে পারত না। যখনি তারা আল্লাহর আনুগত্যের বিরোধিতা করত তখনি ফিরিশতারা তাদেরকে আযাব-গজব দিয়ে ধ্বংস করে দিত। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে তাঁর শাসন ব্যবস্থার এ নীতি আগেই শিখিয়ে রেখে ছিলেন। তাই ফিরিশতারা পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে কাজ করে যাচ্ছিল। এবার যখন স্রষ্টা আদমকে ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা দিয়ে দুনিয়ায় পাঠাতে মনস্ত করলেন তখন ফিরিশতাদেরকে তিনি বিশ্বশাসন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও নতুন কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার জন্য অবহিত করলেন। ফিরিশতাগণের নিজস্ব কোন চিন্তা শক্তি নেই। তাদেরকে পূর্ব থেকে কাজের জন্য জ্ঞান দিয়ে দিতে হয়। কম্পিউটারের মেমোরীতে যেমন কাজ করার জন্য পূর্বেই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান দিয়ে দিতে হয় তেমনি ফিরিশতাদেরকে তাদের কর্মনীতির জ্ঞান আগেই দিয়ে রাখতে হয়। তা না হলে তারা নতুন কাজে সাহায্য-সহযোগিতা তো করেই না বরং বাধা সৃষ্টি করে।

এবার আদম ও আদমের বংশধর আসবে ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা নিয়ে। তারা ভাল-মন্দ, ফেৎনা-ফাসাদ, রক্তারক্তি উভয় কাজই করবে। এমন কি তারা আল্লাহর আনুগত্যের বিরোধীতা পর্যন্ত করতে পারবে। এর জন্য দুনিয়াতে তাদের ধর পাকড় করা যাবে না। এখন থেকে আদম ও আদমের বংশধর ভাল-মন্দ যাই করুক না কেন, ফিরিশতাদের আর বাধা দেয়ার অধিকার নেই। নীরবে তাদের কাজের সহযোগিতা বা আনুগত্য করতে হবে। এ সংবাদ ও কর্মনীতি জানানোর জন্য আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে বিষয়টি অবহিত করলেন। ফিরিশতাদের আনুগত্য করার বিষয়টি আল কোরআনে সেজদা হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। এ সিজদা আমাদের ন্যায় নামাজে সিজদায়রত হওয়া নয়। বরং তা হলো আনুগত্য প্রকাশ। নিম্নে আয়াতে সে কথারই উল্লেখ রয়েছে-

"যখন আমি বললাম ফিরিশতাদেরকে সেজদায় পতিত হও আদমের সম্মুখে, সকলেই সেজদায় পতিত হল ইবলীস ব্যতীত।" (সূরা বাকারাহ : ৩৪)

www.pathagar.com

মূলত আদমকে সেজদা করার অর্থ হলো তাদের ভাল-মন্দ সকল কাজে আনুগত্য করা। এ শিক্ষার মাধ্যমে ফিরিশতাগণকে জ্ঞান দিয়ে দেয়া হল। স্রষ্টার বিশ্বশাসন ব্যবস্থার দ্বিতীয় কর্মপদ্ধতি পূর্বের চেয়ে ভিন্ন ছিল বিধায় খলিফা পাঠানোর কথা জানানো হলে তারা জানার জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আপত্তি তুলেছিল। তারা ভেবেছিল হয়ত আবারও প্রথম শাসন পদ্ধতির অধীনেই নতুন কোন মানব প্রজাতি সৃষ্টি করা হবে। কারণ তারা স্রষ্টার প্রথম শাসন পদ্ধতির অধীনে এমন এক মানব প্রজাতি পেয়েছিল, যারা দুনিয়ায় ফ্যাৎনা-ফ্যাসাদ ও রক্তারক্তি করেছিল। এদেরকে তারাই আযাব-গজব দিয়ে নিশ্চিহ্ন করেছে। কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে দ্বিতীয় শাসন পদ্ধতির কথা জানালেন। তখন তারা বলল-আমাদের জ্ঞান নেই উহা ব্যতীত, যা আপনি আমাদেরকে শিখাইয়াছেন।"

"ফিরিশতারা বলল, আপনি মহান পবিত্র, আমাদের জ্ঞান নাই কেবল উহা ব্যতীত যা আপনি আমাদিগকে শিখিয়েছেন।" (সূরা বাকারা : ৩২)

আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আদম (আ)কে দুনিয়ায় পাঠানোর আগে ফিরিশতাদেরকে জানানো এটাই মূল কারণ। এরপর আরও কোন গোপন রহস্য বিদ্যমান আছে কিনা তা আল্লাহই ভাল জানেন। আদমকে দুনিয়ায় খলিফা হিসেবে পাঠানোর আগে ফিরিশতাগণকে জানানো যেমন রহস্যপূর্ণ, তেমনি আদমকে নাম শিক্ষা দেয়ার বিষয়টিও সে পর্যায়ের। ফলে এ বিষয়টিরও আমাদের তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ফিরিশতাদের অস্তিত্ব ও তাদের জ্ঞানের পরিধি

"আর আল্লাহ আদমকে (সৃষ্টি করে) শিখালেন যাবতীয় বস্তুর নাম (বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ); অতঃপর সেগুলোকে (বস্তুসমূহকে) ফিরিশতাদের সন্মুখীন করে বললেন; তোমরা আমার কাছে বল এ সমস্ত বস্তুর নাম (ও বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কোন বস্তু কোন কাজে লাগে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ফিরিশতারা বলল আপনি মহান পবিত্র, আমাদের জ্ঞান নাই কেবল উহা ব্যতীত-যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী হেকমতওয়ালা।" (সূরা বাকারা : ৩২)

ফিরিশতা হলো আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্ট অদৃশ্য সত্তা। ফিরিশতাদের না দেখেই বিশ্বাস করা ঈমানের শর্ত। কারণ অদৃশ্য জিনিস দেখা মানুষের ক্ষমতার আওতাধীন নয়। সে হিসেবে আল্লাহ এবং ফিরিশতাদেরকে না দেখেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী। তাই ঈমানদার ও আস্তিকগণ না দেখেই আল্লাহ তা'য়ালাকে এবং ফিরিশতাদেরকে বিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু নাস্তিকরা যে জিনিস দেখে না তা বিশ্বাস করতে রাজী নয়। কিন্তু সব জিনিস যে দেখেই বিশ্বাস করতে হবে এমন যুক্তি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও অযুক্তিক। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানে এমন কিছু অদৃশ্য জিনিস আছে, যেগুলি না দেখেই বিশ্বাস করা হয়। যেমন কোয়ার্ক ও এন্টিকোয়ার্ক। তাছাড়া রয়েছে ধ্বনাত্মক তথ্যকণা (Positive Information bit) ও ঋণাত্মক তথ্য কণা (Negative Information bit)। এখানে আদেশ তথ্য কণা বা তথ্য তরঙ্গের সাথে ফিরিশতাদের অস্তিত্বের সম্পর্ক থাকতে পারে। এ সবগুলোর অস্তিত্ব যুক্তি, ব্যাখ্যা, অনুমান ও অনুভবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবু বিজ্ঞানের ভাষায়ও এদের নাম ও অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। অথচ এগুলোর কোনটাই দেখা যায় না।

পৃথিবীতে একই জিনিসের ভাষাগত ব্যবধানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম হয়েছে। যেমন আমরা যাকে পানি বলি এটাকেই ইংরেজী ভাষায় Water

www.pathagar.com

বলা হয়। আবার আরবী ভাষায় একেই 'মা' বলা হয়। বৈজ্ঞানিকভাবে এখনও ফিরিশতাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার হয়নি এ কথা সত্য কিন্তু ধর্মীয় ভাষায় যাকে আমরা ফিরিশতা বলি এমনও হতে পারে বিজ্ঞানের ভাষায় তাকেই অন্য নাম দেয়া হয়েছে।

ফিরিশতাগণ অদৃশ্য সত্তা। তাদের কোন প্রবৃত্তি নেই। তাদের খাওয়া-দাওয়া ঘুম-নিদ্রার প্রয়োজন পড়ে না। তারা পুরুষ-নারী এ শ্রেণীর কিছু নয়। অর্থাৎ ধ্বনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জ বা গুণ তাদের মধ্যে নেই। তারা নৈব্যক্তিক পর্যায়ের। তারা কাপড় পরিধান করে না, স্ত্রী সহবাসও করে না। এরা নুরের তৈরী। নুর অর্থ অনেকে আলোক বলে থাকেন। কিন্তু আলোক তো আমরা দেখতে পাই। মূলত আমরা যে আলোক শক্তিকে দেখে থাকি তা প্রকৃত নুর নয়। নুর তার চেয়ে আরও সূক্ষ্ম জিনিস। যা কোয়ার্ক পর্যায়ের চেয়েও আরও সূক্ষ্ম। এমন সূক্ষ্ম সত্তা শোষণ বা আহার করে না। তাই তাদের থেকে বিকিরণও হয় না। আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করাই তাদের কাজ। তারা আল্লাহর হুকুমে যে কোন অদৃশ্য আকার ধারণ করতে পারে। তাদের আকৃতি একই সাথে অনেকের দৃষ্টিগোচর না হলেও যাকে উদ্দেশ্য করে পাঠানো হয়, তিনিই শুধু তাদেরকে দেখতে পান। যেমন সাহাবীদের সামনে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নিকট জিব্রাঈল (আ) আসলেও তাঁরা জিব্রাইল (আ) কে দেখতেন না। কিন্তু নবীজি (সা) অন্যান্য জিনিসের মতোই তাঁকে দেখতে পেতেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় মৃত্যু পথযাত্রীগণ বার বার চোখ ঢাকতে থাকে। কেন তারা চোখ ঢাকে?

আমরা জানি আল্লাহ তা'আলার এক ফিরিশতা মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। যেহেতু মৃত্যু পথযাত্রী বার বার চোখ ঢাকে, এতেই বুঝা যায় আল্লাহর সেই ফিরিশতা (মৃত্যুদূত) আযরাইল (আ) অদৃশ্য আকৃতি নিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির সামনে আসেন। ফলে সে ভয়ে আতংকিত হয়ে চোখ ঢাকে অথবা ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে।

আল্লাহ তা'আলার ফিরিশতা অসংখ্য। কেউ জমিনে দায়িত্ব পালন করে। আবার কেউ কেউ আসমানে দায়িত্ব পালন করে।এদের মধ্যে প্রধান

www.pathagar.com

ফিরিশতাগণ বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালন করে। তাঁরা কখনো আল্লাহর আনুগত্যের বিরোধী হয় না এবং আল্লাহ যা আদেশ করেন তাই তারা পালন করে। পাক কোরআনে আল্লাহ তা'আলা সে কথাই উল্লেখ করেছেন।

"তারা কখনও আল্লাহ যা হুকুম করেন, তা লংঘন করে না এবং যা আদেশ করেন তাই পালন করে।" (আল কোরআন)

ফিরিশতাদের অস্তিত্বের ধারণা দিতে গিয়ে আমি তাঁদের (ফিরিশতা) অস্তিত্বের সাথে স্রষ্টার "কমান্ড আদেশ"-এর সম্পর্ক থাকার কথা বলেছি। নিম্নের আয়াত থেকে সে তথ্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে স্বীয় আদেশের সাথে কমাণ্ড আদেশ এর সম্পর্ক রয়েছে।

"তিনিই আল্লাহ যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবীকেও এবং তিনি তাদের মধ্যে স্বীয় আদেশ অবতীর্ণ করেন যেন তোমরা অবগত হও যে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান, নিশ্চয় আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সমস্ত বিষয় পরিবেষ্টন করে আছেন।" (৬৫ : ১২)

ফিরিশতাগণের অস্তিত্ব নিখুঁতভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে নিজ দেহ রাজ্যের কার্যব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব অন্তর চোখ খুলে দেখতে হবে।

কারণ আমাদের দেহ রাজ্যের কার্যব্যবস্থা ও আল্লাহর বিশ্ব রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত প্রায় একই রকম। উপরের আয়াতে "স্বীয় আদেশ" ও কমাণ্ড আদেশ একই পর্যায়ের সম্বন্ধযুক্ত শব্দ। আল্লাহর আদেশ বার্তা ফিরিশতাগণই নিয়ে আসেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট জগৎ চিরন্তন নয়। সমগ্র বিশ্ব তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। এক সাথে সৃষ্টির রেণুকণা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব।

আল্লাহ বলেন– "আমি তাদেরকে বাহ্যিক জগতে ও তাদের (অর্থাৎ মানুষের) দেহ ও আত্মার মধ্যে আমার ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকি। যার ফলে সত্যের গুরুত্ব তাদের নিকট প্রকাশিত হবে।" (সূরা হামীম আস সাজদাহ, পারা ২৫ রুকু-৫)

www.pathagar.com

এ বিশ্বজগৎ আল্লাহর রাজ্য। একে স্রষ্টার ইচ্ছা শক্তির প্রকাশের ঘণীভূত অবস্থাও বলা চলে। কিংবা থিওসফির ভাষায়–"চিন্তামূর্তি" বলা চলে। মানুষের আত্মার প্রকাশ আবরণ হলো তার দেহ রাজ্য। মানুষের এ দেহ রাজ্য শাসন বা পরিচালনা করার জন্য যেমন রয়েছে স্নায়ু ব্যবস্থা, তেমনি স্রষ্টার এ বিশ্ব ভূবন শাসনের জন্য রয়েছে অদৃশ্য স্নায়ু রজ্জু। সেই অদৃশ্য স্নায়ূ রজ্জুর সাথে ফিরিশতাদের রয়েছে বিশেষ সম্পর্ক। তাই আমাদেরকে ফিরিশতাদের অস্তিত্ব অনুভব করার জন্য নিজ দেহ রাজ্যের নিগূঢ় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

আল্লাহ বলেন– "নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে নিজ অনুরূপে সৃষ্টি করেছেন।" (আল কোরআন)

এখানে আদমের দেহ আল্লাহর দেহের অনুরূপ এই অর্থে উপরের আয়াতকে বুঝলে চলবে না। কারণ আল্লাহ নিরাকার অনন্ত, অসীম। তাঁর সাথে আকার, আকৃতির এবং গতির কোন সম্পর্ক নেই।

বরং এ আয়াতের মর্মার্থ হলো আদমের দেহ রাজ্য শাসন ব্যবস্থার নমূনা স্রষ্টার বিশ্ব ভূবন শাসনের অনুরূপ। তাই আমাদেরকে মানব দেহের স্নায়ু ব্যবস্থার কার্যধারা স্রষ্টার বিশ্ব শাসন ব্যবস্থার কার্যধারার নিয়ম নীতির অনুরূপ এটিই বুঝতে হবে।

মানব দেহের মূল সচিবালয় হলো মস্তিষ্ক। তেমনি স্রষ্টার মূল সচিবালয় হলো আ'রশ। এখানে উভয়ের মাঝে ব্যবধান হলো মানুষের স্নায়ুব্যবস্থায় শাখা প্রশাখা অদৃশ্য নয়। কিন্তু স্রষ্টার আ'রশের স্নায়ু রজ্জু অদৃশ্য। আত্মা বা রূহ যেমন মস্তিষ্কের মাধ্যমে দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি স্রষ্টা আ'রশের মাধ্যমে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আত্মার নির্দেশ মস্তিষ্ক হয়ে যেমন দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যায় তেমনি স্রষ্টার আদেশ তথ্য তরঙ্গ (Command Information bit) আ'রশ হয়ে মহাবিশ্বের সকল স্থানে গমন করে। মানুষের স্নায়ু ব্যবস্থাতে রয়েছে দু'ধরনের স্নায়ু। এক ধরনের স্নায়ু দেহের নিম্নাংশের খবর মস্তিষ্কে পৌঁছায়। অপর ধরনের স্নায়ু মস্তিষ্কের খবর দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যায়। উভয় ক্ষেত্রে একটা Impulse বা

www.pathagar.com

Information bit খবর আদান-প্রদান করে। কিন্তু এই Information bit এর প্ররোচনায় বা তথ্যের সংকেত অনুযায়ী মস্তিষ্ক বা স্নায়ুর প্রান্তে এক ধরনের জৈব রস (রাসায়নিক পদার্থ) নিঃসৃত হয়। এটিই অঙ্গটিকে কাজ করাতে বাধ্য করে। মানুষের স্নায়ু ব্যবস্থার এই উপাদান (জৈব রস) দেখা যায় এবং ঔষধ হিসেবে তৈরীও করা যায়। কিন্তু স্রষ্টার আ'রশের রজ্জুর সত্তা দেখা যায় না এবং কৃত্রিমভাবে তৈরীও করা যায় না। মূলত স্রষ্টার আ'রশের রজ্জু বেয়ে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে যে অদৃশ্য সত্তা অস্তিত্ব ধারণ করে তার সাথে ফিরিশতাদের অস্তিত্বের সম্পর্ক রয়েছে।

আমি ফিরিশতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার লেখা "সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য" গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছি। পাঠক মহলের কাছে বিষয়টি আরও ব্যাপক ভাবে জানার জন্য সে গ্রন্থটি পড়ার জন্য অনুরোধ রইল। কারণ আদমের আদি উৎস সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ফিরিশতাদের সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আত্মিক আদম সম্পর্কে আমার ধারণা, হতে পারে সে সত্তার অস্তিত্ব Positive Information bit জাতীয় কোন অদৃশ্য সত্তা। সে হিসেবে ফিরিশতাদের অস্তিত্ব হলো Neutral Information bit জাতীয় বিশেষ ধরনের কোন অদৃশ্য সত্তা। এ অদৃশ্য সত্তা Command Information bit হলেও তার চরিত্র Neutral (নিরপেক্ষ ধরনের)। তাদের মধ্যে পুরুষ-নারীর মতো গুণ নেই। এরা প্রয়োজনে আল্লাহর নির্দেশে বিশেষ মুহূর্তে যে কোন আকৃতি ধারণ করতে পারে। এদের আকৃতি এক সাথে অনেকের দৃষ্টি গোচর হয় না। যখন যার কাছে গমন করে সেই শুধু তার অস্তিত্ব দেখে থাকে। এরা তরঙ্গ হিসেবেও থাকতে পারে। আবার বিশেষ কোন মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোন আকৃতি ধারণ করে ক্ষণিকেই মিলিয়ে যেতে পারে। টিভির প্রেরক যন্ত্রের স্ক্যানিং বিন্দুগুলি ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিভ ওয়েভ হয়ে আকাশ পথে চলতে চলতে যখন গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে তখন পূর্বের আকৃতি ফিরে পায়। তারপর যতক্ষণ ঘটনাটি চলতে থাকে ততক্ষণ দৃশ্যটি দেখা যায়, তারপর আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু তার অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যায় না। তরঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায় মহাকাশ জুড়ে। সে আলোকে আল্লাহর আদেশ তথ্য তরঙ্গ "তথ্য মূর্তি" ধারণ করতে পারে। কিংবা "ফোটন-চুম্বক তরঙ্গ" হয়ে আকাশে ঘুরে

www.pathagar.com

বেড়াতে পারে। এর চেয়ে সহজ ভাষায় ফিরিশতাদের অস্তিত্ব বর্ণনা করার কোন উপায় নেই। কারণ ফিরিশতাগণ গায়েবে থাকেন বলে তাদের ডেকে এনে দেখানো সম্ভব নয়। তাই গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করা ফরজ। অর্থাৎ বিশ্বাসে যেমন রয়েছে মুক্তি তেমনি নিজের মধ্যেই রয়েছে জগৎ-মহাজগতের কুদরতের নিদর্শন।

আল্লাহ্ বলেন–"তোমার নিজের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন; তুমি কি তা দেখ না।" (আল কোরআন)

ফিরিশতাদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত। তারা চিন্তা করে কোন কিছু আবিষ্কার করতে পারে না। আবার কোন প্রশ্নের জবাবও দিতে পারে না। এদের কাজ একমুখী অর্থাৎ এদের মধ্যে কেহ উর্ধ্বজগতের দায়িত্ব পালন করে, আবার কেহ নিম্ন জগতের দায়িত্ব পালন করে। টিভি ও রোবোট মানুষের আবিষ্কৃত দু'টি যন্ত্র। টিভির মাধ্যমে প্রেরক যন্ত্রের তথ্য ও ছবি প্রদর্শন হয়। কিন্তু সে প্রেরক যন্ত্রের কাছে কোন তথ্য পাঠাতে পারে না। অপরদিকে রোবোটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান দু'টিই হয়। এক্ষেত্রে টিভি এবং রোবোটের কাজ যেমন ভিন্ন তেমনি ফিরিশতা ও মানুষের কাজের রয়েছে ভিন্নতা। কম্পিউটার বা রোবোটে পূর্ব থেকে জ্ঞান দেয়া না থাকলে যেমন সেগুলো কোন তথ্য দিতে পারে না তেমনি আদমকে পূর্ব থেকে জ্ঞান দেয়া ছিল বলে তিনি জিনিসের নাম বলতে পেরেছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাদের মধ্যে সে জ্ঞান দেয়া ছিল না বলে তারা কোন জিনিস দেখেও তথ্য প্রেরণ করতে পারে নি। তাদের মধ্যে একই সাথে তথ্য আদান প্রদান করার ব্যবস্থা নেই। একদল উর্ধ্বজগৎ থেকে তথ্য নিয়ে আসে। অপর দিকে অন্য দল নিম্ন জগৎ থেকে উর্ধ্বজগতে তথ্য দিয়ে যায়। এক্ষেত্রে মানুষের জড়দেহের একটি জীবকোষ থেকেও তথ্য আদান-প্রদান হয়। তাই ফিরিশতাদের জ্ঞানের পরিধি মানুষের চেয়ে একান্তই কম বা সীমিত। নিম্নের হাদীসে কুদসীর একটি উদ্ধৃতি থেকে সে ধারণা নিতে পারি।

"নিশ্চয়ই ফিরিশতাগণ বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি বনী আদমকেও সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

অতঃপর আপনি তাদেরকে এরূপ স্বভাব দান করেছেন যে, তারা খাদ্য খায়, পানীয় পান করে, কাপড় পরিধান করে, স্ত্রী সহবাস করে, চতুষ্পদ পশুর পিঠে আরোহণ করে, নিদ্রা যায় এবং বিশ্রাম করে। কিন্তু আপনি তাদের জন্য দুনিয়া নির্ধারিত করে দিন। আর আমাদের জন্য আখিরাত।" তখন মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ বললেন, "আমি যাকে স্বহস্তে তৈরী করেছি এবং যাতে আমার সৃষ্ট রূহ ফুঁকে দিয়েছি, তাকে ইহার মত করব না। যা হোক, আমি বলেছি, 'হয়ে যাও, তখনই ইহা হয়ে গেল।"

(হাদীসে কুদসী)

সাহিত্যের ভাষায় ফিরিশতাদেরকে বলতে পারি আল্লাহর আনুগত্যশীল দূত। থিওসফির ভাষায় "তথ্য মূর্তি"। বিজ্ঞানের ভাষায় "নিরপেক্ষ তথ্য কণা" বা ফোটন চুম্বক-তরঙ্গ ইত্যাদি। এবার যুক্তির ইতি টেনে সত্যের নিগুঢ় রহস্যের সন্ধানে সকলকে কোরআনের দিকে ফিরে আসার আহবান জানাই। আর মনে করে দিতে চাই আদমের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা, কোরআনের সাথে যাচাই বাছাই করে দেখুন। দেখুন কোনটি সত্য আর কোনটি পৌরাণিক কাহিনী।

উপসংহারে ইমাম গাযযালী (র) ফিরিশতাদের সম্পর্কে যে তথ্য তুলে ধরেছেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হলো।

" যে সূক্ষ্ম শক্তি তোমার মস্তিষ্কে থেকে স্নায়ুসমূহকে আলোড়িত করে এবং তার সাহায্যে হাতের অঙ্গুলী ও অবশেষে কলম পরিচালিত করে তদরূপ এক প্রকার শক্তি আরশ ও কুর্সীতে অবস্থান করে আকাশ ও গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে পরিচালিত করে এবং ইহার প্রভাব নিম্ন জগৎ পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রকৃতিকে আলোড়িত করে। শেষোক্ত শক্তিকে ফিরিশতা বলে।" (সৌভাগ্যের পরশমণি-৬০)

www.pathagar.com

আদমকে নাম শিক্ষা দেয়ার মর্মার্থ

"অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদমকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন।" (আল কোরআন)

"হে ফিরিশতাগণ! যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও তবে তোমরা এই সকল জিনিসের নাম বল।" (আল কোরআন)

"ফিরিশতারা বলল, আপনি মহান পবিত্র; আমাদের জ্ঞান নাই কেবল উহা ছাড়া যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন।" (সূরা বাকারা : ৩২)

আদম ও ফিরিশতাগণের মধ্যে জ্ঞানের দিক থেকে আদম শ্রেষ্ঠ। আদমকে নাম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফিরিশতাদেরকে নাম শিক্ষা দেয়া হয়নি। এখানে নাম শিক্ষা দেয়ার ফলে আদম জ্ঞানের দিক থেকে ফিরিশতাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট হলো। সুতরাং নাম শিক্ষা দেয়ার মাঝে বিশেষ গুরুত্ব নিহীত রয়েছে। এ বিশেষ গুরুত্বের মর্মার্থ কি?

দুইজন লোককে একই সঙ্গে যদি প্রশ্ন করা হয়, তার নাম কি? একজন নিজ জ্ঞান থেকে বলল তার নাম আঃ জব্বার। অন্য জন কিছুই বলতে পারল না। এক্ষেত্রে যে উত্তর দিতে পারল সে জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হবে এবং দুজনের মধ্যে সে হবে শ্রেষ্ঠ।

সৃষ্টি জগতের কোন জিনিসের নিজস্ব কোন ইলম বা জ্ঞান নেই। এজন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগেই জ্ঞান দিয়ে দেয়া হয়। ফলে যাকে যে বিষয়ের জ্ঞান বা ইলম শিক্ষা দেয়া হয়। সে অন্যের চেয়ে এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট হয়। এখানে ফিরিশতাদেরকে খাটো করা ও আদমকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ আদমকে নাম শিক্ষা দেননি। বরং এখানে যার যে দায়িত্ব তা বুঝিয়ে দেয়াই আল্লাহর মূল উদ্দেশ্য। জগতের সকল কাজ একই প্রজাতির মাধ্যমে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। যার যার পরিসরে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে এটাই স্রষ্টার বিধান।

www.pathagar.com

"আর তিনি আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শিখালেন, পরে সে সব জিনিস ফিরিশতাদের সামনে রেখে বললেন, আমাকে তাদের নাম বলে দাওতো, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়। তারা বললো, সব মহিমা তোমার। তুমি আমাদের যা শিখিয়েছ তার বাইরেতো আমাদের কিছুই জানা নেই, নিশ্চয় তুমি মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত! তিনি বললেন, 'ওহে আদম। এদেরকে এই সকল নাম বলে দাওতো! যখন সে তাদের নাম বললো, আল্লাহ বললেন, কেমন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আসমান যমিনের যা কিছু গোপন আছে; সমস্তই আমি জানি এবং আমি তাও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন রাখ।" আল-কোরআন ২ : ৩১-৩৩

আদমকে নাম শিক্ষা দেয়ার বিষয়টি বোধগম্য করার জন্য নিম্নে একটি উদাহরণ দেয়া হলো। মনে করি দু'টি কম্পিউটারের মধ্যে একটিতে পূর্বেই কোন প্রোগ্রামের তথ্য বা জ্ঞান দিয়ে দেয়া হলো এবং সেটিতে সুইচ দেয়ার সাথে সাথে উত্তর দেয়ার স্বাধীনতাও দিয়ে রাখা আছে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে এ ব্যাপারে কোন তথ্য বা জ্ঞান দিয়ে দেয়া হলো না। এবার উভয়ের কাছে যখন কোন তথ্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হবে তখন প্রথমটি উত্তর দিতে পারলেও দ্বিতীয়টি কোন উত্তর (তথ্য) দিতে পারবে না, এটাই সত্য। তাই ফিরিশতাগণকে যখন জিনিসের নাম জিজ্ঞেস করা হলো তখন তারা কিছুই বলতে পারল না। কিন্তু আদমকে পূর্ব থেকে জ্ঞান দিয়ে দেয়ায় তার পক্ষে নাম বলা সহজ হলো। আল্লাহ অসীম জ্ঞানের মালিক। তার মধ্যে অতিকিঞ্চিত জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন।

আল্লাহ বলেন, "তোমরা জ্ঞানের অতি সামান্য অংশই লাভ করেছ।" (আল কুরআন)

আল্লাহ তা'আলা যাকে যতটুকু জ্ঞান দান করেছেন, এ ব্যাপারে সে ততটুকু সত্যের সন্ধান পেয়েছে। আদমকে দেয়া জ্ঞানের মাধ্যমে সে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত হলো। আদমের প্রজাতি তাদের জ্ঞান দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্ব তালাশ করে। তাঁর (আল্লাহর) অসীম কুদরতকে জানতে চায়। কারণ জানার মধ্যেই আদম জাতের কল্যাণ নিহীত। অর্থাৎ জানতে

www.pathagar.com

পারলেই সে তার প্রভুকে বড় করে মানবে, তাঁর আনুগত্য করবে। সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত হবে। তাই প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ইলম শিক্ষা করা ফরজ।

ইলম বা জ্ঞান শিক্ষা ছাড়া মানুষ অন্ধ থাকে। সে স্রষ্টাকে চিনতে পারে না। এবং নিজের সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ। তারা সৃষ্টির রহস্য বোঝে না। দুনিয়ায় আসার উদ্দেশ্য কি তাও তারা জানে না। পরিণামে তাদের জীবন হয় ব্যর্থ। কিন্তু যারা দুনিয়ায় এসে খোদায়ী ইলম চর্চা করে, তারাই আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মেনে চলে, তাঁর আনুগত্য করে। কিন্তু যারা শুধু দুনিয়াবী ইলম শিক্ষা করে, দুনিয়ার পথে কামিয়াব হওয়ার জন্য দুনিয়ার সম্পদের পথে ছুটতে থাকে, তারা অতীতের প্রদত্ত জ্ঞান ভুলে যায়। ভুলে যায় আখেরাতের কথা। তারা তখন আল্লাহর বিধান মানে না, তাঁর আনুগত্য করে না। তাই দুনিয়ার জীবনে এসেও খোদায়ী জ্ঞানের (শিক্ষার) চর্চা করতে হয়। এতে স্রষ্টার নাম শিক্ষা দেয়ার অতীত বৈশিষ্ট্য তার স্মৃতিতে ফিরে আসে। আদমকে জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার মর্মার্থ হলো আদমের মেমোরীতে পূর্ব থেকে স্রষ্টার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে দেয়া এবং তার ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা অর্পন। আদম প্রজাতির ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে বলেই তারা ভাল মন্দ উভয় কাজই করতে পারে।

অপরদিকে আদম প্রজাতি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান খাটিয়ে নিজের কল্যাণ সাধনও করতে পারে। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ যাকে জ্ঞান দান করেছেন, তাকে অশেষ কল্যাণ দান করেছেন।" (আল কুরআন)

আদমকে নাম শিক্ষা দেয়ার পর আদম জাতের রূহসমূহকে লক্ষ্য করে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সাথে সাথে সকল রূহ জবাব দিয়েছিল- হাঁ, 'হে প্রভু, আপনিই আমাদের রব।'

আদম জাতের রূহসমূহ এ স্বীকৃতি দেয়া থেকে বুঝা গেল যে, তাদের মেমোরীতে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান অতীতে মওজুদ ছিল। কিন্তু পরে দুনিয়ায় এসে যাতে ভুলে না যায় সেজন্যও তাদেরকে সতর্ক করা হয়।

www.pathagar.com

"হে রূহগণ! অবশেষে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানিনা যে, কেহ আমাদেরকে আমাদের খালেক এবং মালেক সম্বন্ধে বলেছে যে, তাঁকে কখনও ভুলে যেয়ো না। অথবা তা বলতে থাক যে, আমাদের পিতা-পিতামহগণ শেরেক করেছে। আমরা তো তাদের পর তাদের সন্তান-সন্ততি।" (আল কোরআন)

কাউকে না জানিয়ে, না সতর্ক করে শাস্তি দেয়া স্রষ্টার বিধান নয়। তাই রূহ সমূহকে জ্ঞান দেয়ার পরও দুনিয়াতে নবী, রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে সত্যের পথে, কামিয়াবির পথে ডেকেছেন। এরপরও যারা ভুল পথে চলবে তাদের কোন ওজর আপত্তি হাশরের দিন আল্লাহ শুনবেন না। তাই আমাদেরকে স্রষ্টার নাম শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে, খোদায়ী জ্ঞান বা ইলম চর্চা করতে হবে। "পড় এবং তোমার প্রভু অতি দানশীল; যিনি কলম দিয়ে লিখতে শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যা মানুষ জানত না।" (৯৬:৩৫)

মূলতঃ মানুষের আত্মা ও দেহ গঠনের কোষকলাগুলো তথ্যের ভাণ্ডার। একটি মানুষের একটি কোষের মধ্যে যে তথ্য রয়েছে তা দিয়ে সহস্রাধিক ভলিয়মের পুস্তক সৃষ্টি করা সম্ভব। এভাবে মানব দেহের একটি কোষ এক একটি তথ্যের লাইব্রেরী। কম্পিউটারের মেমোরীতে তথ্য দিয়ে রাখলে সেটি যেমন তথ্যের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে তেমনি মানব আত্মার আদি পুরুষ ও রূহসমূহকে যে তথ্য দেয়া হয়েছিল, সে অনুযায়ীই তারা কাজ করবে– এটাই কথা ছিল। এবং পরবর্তী পর্যায়ে বংশগতির ধারায় সে তথ্য নতুন প্রজন্মের কাছে চলে আসে– এটাই নিয়ম। কিন্তু কম্পিউটার থেকে ভাইরাসের আক্রমণে যেমন তথ্য হারিয়ে যেতে পারে তেমনি আদম প্রজাতির মেমোরী থেকে শয়তানের আক্রমণে পূর্বে প্রদত্ত জ্ঞান হারিয়ে যেতে পারে। এরপরও পূর্বতন প্রজন্মের গঠন; স্বভাব-চরিত্র নতুন প্রজন্মের কাছে কিছু হলেও বিদ্যমান থাকে। তাই আদমের মোমেরীতে পূর্ব থেকে জ্ঞান দেয়া ছিলো বলে সে সহজেই প্রদত্ত জিনিসের নাম বলে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

জিন ও শয়তানের অস্তিত্ব

স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যের অন্ত নেই। আঠার হাজার মাখলুকের মধ্যে জিন ও শয়তান একই গোত্রের দু'টি ভিন্ন নাম। মূলত: জিন গোত্র থেকেই শয়তানের উদ্ভব হয়েছে। শয়তান হলো জিনদের মধ্যে স্রষ্টার অভিশপ্ত এক নাম। সে অহংকারের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর আনুগত্যের বিরোধীতা করে আদমকে সেজদা করেনি। তাই শয়তান অভিশপ্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত।

"আমি তোমাকে সেজদা করতে হুকুম করলাম? তুমি সেজদা করলে না কেন? ইবলিস বলল, আমি আদম হতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ।" (আল কোরআন)

আল্লাহ পাক ইবলিসকে বললেন– "এখান থেকে ঘৃণিত এবং বিতাড়িত হয়ে যা। যারা তোর অনুগত হবে তাদের সকলের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (সূরা হিজর)

ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা শয়তান সম্পর্কে অবহিত আছি। শয়তানকে বিশ্বাস করা ঈমানের শর্ত। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এখনও শয়তানের অস্তিত্ব আবিস্কার করা সম্ভব হয়নি। কিংবা জিন ও শয়তান বলতে কোন অদৃশ্য সত্তা আছে, একথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোথাও স্বীকার করা হয়নি। বিজ্ঞান শয়তানের অস্তিত্ব আবিস্কার করতে না পারলেও আমরা শয়তানের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারব না। কারণ শয়তানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা মানে ঈমানের বিপরীত বিশ্বাসে চলে যাওয়া।

আমরা চার মাত্রিক জগতে বাস করি বলে (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ্য, উচ্চতা ও সময়ের ডাইমেনশন) অন্য কোন মাত্রিক জগতের জিনিসের অস্তিত্ব হয়ত দেখতে পারি না। জগৎ কি চার মাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? এর জবাবে বলা যায় বৈজ্ঞানিকগণ এখন আরও অনেক ডাইমেনশনের (মাত্রা) জগতের কথা চিন্তা করছেন। তার মধ্যে নিগেটিভ ডাইমেনশনের জগৎ একটি রহস্যময় জগৎ।

www.pathagar.com

এমন জগতের উপাদান আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও আমরা সেগুলো দেখিনা। তৎমধ্যে বলা যায় প্রতি বস্তুর কথা। এর উপাদান আমাদের অস্তিত্ব থেকে বিকীর্ণ হলেও সেগুলোকে আমরা দিখিনা। কারণ দেখিনা বলেই কোন জিনিসের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে আমরা শয়তানকে না দেখলেও তারা আমাদেরকে দেখে। তারা হলো আগুনের তৈরী।

"জিনকে আমি জলন্ত অগ্নি শিখা হতে পূর্বেই সৃষ্টি করেছি।" (আল কোরআন)

"নিশ্চয়ই (শয়তান) এবং তার বংশাবলী এমনভাবে তোমাদেরকে দেখতে পায় যেভাবে তোমরা দেখতে পাওনা।" (আল কোরআন)

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার প্রাকৃতিক নিয়মের বন্ধনে আমরা বন্দি বলে জিন ও ফিরিশতার অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু দুনিয়াতে যে জিন জাতি আছে এবং জিন থেকেই যে শয়তানের উদ্ভব হয়েছে তার স্বাক্ষী হলো আল কোরআন। কোরআনের শ্বাশত বাণীই জিন ও শয়তানের অস্তিত্ব প্রমাণের বড় দলিল। কারণ চৌদ্দশত বছরের মধ্যে কোরআনের বাণীর বিকল্প কোন তথ্য এখনও কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি।

"আমি জিন ও ইনসানকে (মানুষকে) আমার ইবাদাত ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য সৃষ্টি করিনি।" (আল কোরআন)

"সে জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং সে আল্লাহর হুকুমের না-ফরমানী করেছিল।" (আল কোরআন)

আগেই বলেছি আমরা চার মাত্রিক জগতে বাস করি বলে তার চেয়ে বেশী কিংবা কম মাত্রার জগতের কোন জিনিসের অস্তিত্ব দেখি না। অর্থাৎ বর্তমান প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে অন্যান্য ডাইমেনশনের বস্তু বা সত্তার অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে। এমনও হতে পারে জিন ও শয়তান আমাদের চেয়ে অন্য কোন মাত্রিক জগতে বাস করে। বর্তমান জগতের প্রাকৃতিক বিধানের আলোকে শয়তান ও জিন আমাদেরকে

www.pathagar.com

দেখতে পায়। কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখতে পাইনা। যখন এ জগতের বর্তমান প্রাকৃতিক নিয়ম অচল হয়ে যাবে তখন আমরা অন্য ডাইমেনশনের জগতে চলে যাব, ফলে আমরা শয়তান ও জিনকে চাক্ষুষ দেখতে পাব। বৈজ্ঞানিকগণ নিগেটিভ ডাইমেনশনের যে জগতের কথা ভাবছেন, সে জগতের বৈশিষ্ট্য হবে বর্তমান জগতের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন বর্তমানে প্রোটন কণার চার পাশে ইলেকট্রন ঘোরে। কিন্তু নিগিটিভ ডাইমেনশনের জগতে ইলেকট্রন (-আদন) বস্তুর কেন্দ্রে থাকবে আর প্রোটন তার চারপাশ দিয়ে ঘুরবে। এটি নিগিটিভ ডাইমেনশন জগতের ধারণা। সে জগতের প্রাকৃতিক রীতিনীতি হবে বর্তমান জগতের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন আমাদের প্রশ্ন জিন ও শয়তান কি? এদেরকে দেখা না গেলেও কি তাদের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার মতো নয়?

বৈজ্ঞানিকগণ জগৎ সৃষ্টির মূল উপাদান হিসেবে চারটি মৌলিক কণা ও চারটি মৌলিক বলকে ধরে নিচ্ছেন। এসব কণাগুলো পরস্পরের কাছাকাছি আসলেই বলগুলির উৎপত্তি ঘটে।

এ চারটি কণা হলো–

১. প্রোটন (p)

২. ইলেকট্রন (e)

৩. নিউট্রন (n)

৪. নিউট্রিনো (r)

এ চারটি মৌলিক বল হলো–

১। মাধ্যাকর্ষণ বল

২। ইলেকট্রোমেগনেটিক বল

৩। দুর্বল নিউক্লিয়ার ফোর্স (কণাগুলো $১০^{-১৬}$ সেঃ মিঃ এর কম দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করলে এই বলের উৎপত্তি হয়)

৪। সবল নিউক্লিয়ার ফোর্স ($১০^{-১৩}$ সেঃ মিঃ এর চেয়ে নিকটে আসলে এ বল উৎপন্ন হয়)

www.pathagar.com

কিন্তু এ চারটি বল ও কণা ছাড়াও বর্তমানে আরও একটি বল ও কণার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হচ্ছে। সে কণাটি হলো "গ্যাভিটন"। আর বলটি হলো বিকর্ষণ বল। তাহলে ধরে নেয়া যায় জগৎ সৃষ্টির মূল উপাদানের মধ্যে মৌলিক কণা হলো ৫টি এবং মৌলিক বলও ৫টি।

এ পর্যায়ে এসে দেখা যায় মৌলিক কণাগুলোর অস্তিত্বে রয়েছে ফোটন কণা (আলোক কণা) আবার এ ফোটন কণা হলো কোয়ার্কের পরবর্তী ধাপ। আর কোয়ার্ক হলো তরঙ্গের আধার। ধারণা করা হয় যে ছয় ধরনের কোয়ার্ক নিয়েই মৌলিক কণাগুলো গঠিত হয়েছে। এ সব কোয়ার্কে উৎপত্তি হয় তথ্য কণা (Information bit) থেকে। মূলতঃ বস্তুর প্রত্যক্ষ রূপ হলো তথ্য কণার জমাটবদ্ধ অবস্থা। আবার এ তথ্যকণা গুলোর মাঝে রয়েছে ধ্বনাত্মক তথ্যকণা (+), ঋণাত্মক তথ্যকণা (-), নিরপেক্ষ তথ্যকণা (কমাণ্ড তথ্যকণা) এবং বর্জ্য তথ্যকণা। এর পর জগত-মহাজগতে পদার্থের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে আর কোন সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলা যায় জিন ও শয়তানের অস্তিত্বের সাথে "বর্জ্য" তথ্য কণার" সম্পর্কের বিষয়টি উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এ মহাবিশ্বের প্রত্যেক জিনিসের কিছু না কিছু বর্জ্য আছে। আমরা যা খাই সেগুলো হজম হলেও এর কিছু বর্জ্য থাকে। এগুলো আমরা প্রস্রাব, পায়খানার মাধ্যমে নিষ্কাশন করি। আবার দেহকোষ থেকেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু শক্তি বিকিরণ হয়। নিষ্কাশিত বর্জ্য ও বিকীর্ণ শক্তির মধ্যে জঘন্যতম খারাপ প্রকৃতির বস্তু (উপাদান) থাকে। যেমন আমাদের দেহ থেকে কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তিও বের হয়।

এর বর্ণ কালো ধোঁয়ার ন্যায়, আলকাতরা বর্ণের মতো থাকে। আবার আমাদের পয়ঃনিষ্কাশিত বর্জ্য দূষিত ও দুর্গন্ধময় হয়। যখন একটা জিনিস পুড়িয়ে বা হজম করে নিষ্কাশন করা হয়, তখন এর মধ্যে বর্জ্য থাকবেই। গাড়ীর তৈল পুড়ে শক্তি উৎপাদনের পাশাপাশি তার থেকে কালো ধোঁয়াও বের হয়। শয়তান হলো জগৎ মহাজগতের বর্জ্য পর্যায়ের কোন সত্তা। এখানে এসেও প্রশ্নের উদয় হলো এদের উৎপত্তি হয়েছে কি করে?

www.pathagar.com

প্রকৃতিতে দেখা যায় একটা সত্তা বা উপাদান থেকে যখন অন্য কোন সত্তা বা উপাদানের উৎপত্তি হয় তখন এর থেকে কিছু শক্তি বিকিরণ বা অপচয় কিংবা বিচ্যুতি ঘটে। যেমন নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ায় যখন নিউট্রন দিয়ে প্রোটনকে আঘাত করা হয় তখন চেইন বিক্রিয়ায় প্রোটনগুলো ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গতে থাকে এবং এক সময় তাদের থেকে পারমানবিক শক্তিও বের হয়ে আসে। এ শক্তি জগৎ ও মানুষের মাধ্যমে অপব্যবহারে চরম ধ্বংস বয়ে আনে অথবা সুষ্ঠ ব্যবহারে সাফল্য বয়ে আনে।

শয়তান আত্মিক পর্যায়ে আদম জাতের মহাশত্রু। শয়তানের উৎপত্তি একটা বিশেষ মুহূর্তের ঘটনা। অর্থাৎ যখন আত্মিক পর্যায়ে একমাত্র মানব আদম (নর) থেকে তার সঙ্গীনী বিবি হাওয়াকে (নারীরা ঋণাত্মক সত্তা) পয়দা করা হয় তখন আল্লাহর নির্দেশ তরঙ্গ (কমাণ্ড আদেশ) আদমের অস্তিত্বে আঘাত করলে তার থেকে আদমের সহধর্মীনি (নারী) সৃষ্টি হয়। অতঃপর তার পাশাপাশি বর্জ্য সত্তার (শয়তানের) উৎপত্তি ঘটে। এ বর্জ্য সত্তাই আত্মিক পর্যায়ে শয়তানের ভূমিকা পালন করে। মূলতঃ শয়তানের উৎপত্তি আদমের উৎস থেকে। জিন জাতিরও উৎপত্তি আদমের অস্তিত্ব থেকে। স্রষ্টার বিধানে জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য। আল্লাহর ইবাদাতের অর্থ হলো, যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে ঐ কাজে নিঃশর্তভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা। এক্ষেত্রে কারও অস্তিত্বের যদি বিনাশও ঘটে তবু আল্লাহর আনুগত্য করে যেতে হবে। এটাই আনুগত্য বা ইবাদাতের শর্ত। কিন্তু শয়তান সে শর্ত মানেনি। তাই সে অভিশপ্ত হয়েছে।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে আদম থেকে বর্জ্য সত্তার (কৃষ্ণকায়া) উৎপত্তির কথা–নিম্নে হাদীসটি উল্লেখ করা হলো।

"আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে পয়দা করলেন, তাঁকে পয়দা করে তাঁর ডান কাঁধে করাঘাত করলেন, তারপর তাঁর সন্তানদেরকে বের করলেন, এরা এরূপ শুভ্র যেন মুক্তার ন্যায় উজ্জল দুগ্ধ। তারপর তিনি তাঁর বাম কাঁধে করাঘাত করলেন এবং কৃষ্ণকায়া সন্তান বাহির করলেন; যেন তারা

www.pathagar.com

কাল কয়লা। তারপর তিন তাঁর ডান হাতের সন্তানদের সম্বন্ধে বললেন, এরা জান্নাতবাসী হবে আর তাতে কোন পরওয়া নেই। আর তাঁর বাম হাতের তালুস্থিত সন্তান সম্বন্ধে বললেন, "এরা জাহান্নামের যাবে, আর এই ব্যাপারে কোন পরওয়া নেই।" আহমদ ও ইবনু আসাকির ইহা আবদু দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

পৃথিবীতে আমাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তির মধ্যে কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি যেমন আমাদের অস্তিত্ব থেকে বের হয় তেমনি আত্মিক পর্যায়ে আদমের অস্তিত্ব থেকে তাঁর সহধর্মীনি পয়দা হওয়ার মুহূর্তে শয়তানের (কৃষ্ণকায়া সত্তা বা বর্জ্য সত্তার) উৎপত্তি ঘটে। আমরা আত্মিক পর্যায়ে আদম (+), হাওয়া (-), ফেরেশতা ও শয়তানের কথা ধর্মীয় বিধান থেকে জানতে পারি। অপর দিকে বস্তুকণার মধ্যে রয়েছে প্রোটন (+), ইলেকট্রন (-), নিউট্রন, ও নিউট্রোনো। শয়তানের সত্তা যেমন আত্মিক পর্যায়ে রয়েছে তেমনি বস্তুর পরতে পরতে তার অস্তিত্বের অংশ রয়েছে। রাসূল (সা)বলেন– "মালাউন শয়তান মানুষের দেহে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হয়; আমি ভয় করছি তোমাদের মনে শয়তান কোন কথা ঢেলে না যায়।" (আল হাদীস)

"প্রত্যেক মানুষের জন্যই একজন শয়তান নির্ধারিত, সে একটি খারাপ জিন।" (আল হাদীস)

শয়তান আদম জাতের একটা বড় অংশকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। শয়তান সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল এ জন্যে যে, শয়তান না থাকলে সৃষ্টির সম্প্রসারণ সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহারণ দেয়া হল।

আমরা যদি একটা বৈদ্যুতিক বাল্বের দিকে লক্ষ্য করি তখন সেটিতে দেখতে পাই Positive phase, Negative phase ও Neutral phase-এর সাথেও একটি কুণ্ডলীকৃত তার লাগানো আছে। এ কুণ্ডলীকৃত তারটি দিয়ে বিদ্যুত প্রবাহ চলতে থাকলে এক উজ্জল সত্তা বিকিরণ হয়। কিন্তু এই বাঁকা তারটি যদি একটি বা দু'টি phase এর সাথে লেগে থাকে তবু কোন উজ্জল সত্তা (আলোক তরঙ্গ) বের হয় না। অথচ তিনটি

www.pathagar.com

phase-এর সাথে লেগে থাকলে বিদ্যুত প্রবাহ চলতে থাকলে সেটির গা জ্বলে জ্বলে আলোক শক্তি বের হয়। এ আলোক শক্তি জড় পদার্থের মৌল আদানের গর্ভে বাস করে। তাই আলোক শক্তি সৃষ্টি না হলে জড় পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। আবার কুণ্ডলীকৃত তারটি না থাকলে আলোক শক্তি সৃষ্টি হওয়ারও পথ ছিল না। কিংবা ধনাত্মক (+), ঋণাত্মক (−) ও নিরপেক্ষ মাধ্যমগুলো সফল ও উৎপাদনশীল মিলও সম্ভব হতো না। এক্ষেত্রে বাঁকা কুণ্ডলীকৃত মাধ্যমটির গা জ্বলে জ্বলে তার অস্তিত্ব বিনাশের দিকে চলে গেলেও সৃষ্টির সম্প্রসারণের জন্য তার গুরুত্ব কম নয়। তবে বাঁকা কুণ্ডলীকৃত তারের কিছু না কিছু সূক্ষ্ম অংশ ও তার গুণ আলোক শক্তির গায়ে লেগে থাকে। এ ধরনের সত্তা মানব প্রজাতির তথা জগৎ সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণূর গহব্বরে লুকিয়ে আছে। তাই মানব জাতিকে যতই ধুঁয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয় না কেন তার মাঝে শয়তানী স্বভাব কিছু না কিছু লেগেই থাকে। এজন্য আদমের আত্মিক ও দৈহিক সত্তার পরতে পরতে শয়তানের অস্তিত্ব ও গুণাগুণ বিদ্যমান রয়েছে। শয়তান ও শয়তানী সত্তার সূক্ষ্ম উপাদান, সৃষ্টির কৌশলে আদমী সত্তার গণ্ডির মধ্যে লুকিয়ে আছে। আল্লাহ বলেন–"শয়তান বলল, আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও। আল্লাহ বললেন যে তোমার জন্য অবকাশ। ইবলিশ বলল, তুমি যখন আমার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছ তখন তোমার বান্দাকে সিরাতুল মুসতাকীম হতে বিচ্যুত করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকবো, তারপর সামনে হতে, পেছন হতে ডান হতে বাম হতে আক্রমন করব। সুতরাং তুমি দেখবে তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে।" (আল কোরআন)

আল্লাহ পাক তখন ইবলিসকে বললেন–"এখান হতে ঘৃণিত এবং বিতাড়িত হয়ে যা। যারা তোর অনুগত হবে তাদের সকলের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (সূরা হিজর)

দুনিয়াতে জিন ও শয়তান নেই এ কথার কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। বরং জিন ও শয়তান যে আছে তার হাজরো রকমের প্রমাণ দেয়া যাবে। মানুষের দেহ ও আত্মার পরতে পরতে শয়তানী সত্তা মিশে আছে বলেই মানষ শত হেদায়েতের বাণী শুনার পরও শয়তানী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

পাশাপাশি মানুষের কর্মের বিকীর্ণ শক্তিতেও রয়েছে বর্জ্য (কৃষ্ণকায়া) চরিত্রের কণার গুণাগুণ। বিকীর্ণ শক্তি নষ্ট হয়ে কৃষ্ণকায়া বর্ণ ধারণ করবে। ফলে জাহান্নামে তাদের দেহের রং হবে আলকাতরার মতো। একটা বস্তুকে যখন অন্য একটা বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয় তখন ঐ বস্তুটি থেকে একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো জিনিস বের হয়। আমরা যখন লোহা কিংবা পাথরকে অন্য কোন শক্ত জিনিস দিয়ে অথবা ঐ জাতীয় জিনিস দিয়ে আঘাত করি তখন এরূপ জিনিস বের হতে দেখি। জিন ও শয়তান জ্বলন্ত অগ্নি শিখা দিয়ে তৈরী, এ কথা আল কোরআনে বলা হয়েছে।

"জিনকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শিখা হতে পূর্বেই সৃষ্টি করেছি।" (আল কোরআন)

আদম থেকে হাওয়াকে পয়দা করার সময় তাঁর সত্তাতে আঘাত করা হলে, আদম থেকে হাওয়া পয়দা হওয়ার পাশাপাশি জ্বলন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় যে সত্তাটি বের হয়, তার সাথে জিন পয়দা হওয়ার মিল আছে। অপরদিকে শয়তান হলো খারাপ জিন। এটি নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার মতোই একটি প্রক্রিয়া। নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার সময় সেখান থেকে পারমানবিক শক্তি বের হয়। এ শক্তি মানুষের উপকার ও অপকার উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। শয়তান বা সৃষ্টির বর্জ্য সত্তা তেমনি সৃষ্টির সম্প্রসারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবার মানব জাতির জন্য অভিশাপ স্বরূপ।

শয়তানকে পুরোপুরি বুঝতে হলে আমাদেরকে স্রষ্টার বিশ্ব শাসন ব্যবস্থার সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে, তা না হলে শয়তান সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ বলেন– "নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে নিজ অনুরূপে সৃষ্টি করেছেন।" (আল কোরআন)

এ আয়াতের মর্মার্থ এই নয় যে, আল্লাহকে দেখতে আদমের অনুরূপ। বরং এর মর্মার্থ হলো আল্লাহর বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা আদমের দেহ রাজ্য শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। আদম যেমন মস্তিষ্ক দ্বারা তার দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে

www.pathagar.com

তেমনি স্রষ্টা আরশের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আদমের মস্তিষ্কের যেমন দু'ধরনের স্নায়ূ ব্যবস্থা আছে (Motor, Sensory)। তেমনি স্রষ্টার বিশ্ব শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রনকেন্দ্র আরশের দু'ধরনের কার্যব্যবস্থা রয়েছে। এক শ্রেণীর স্নায়ূ (Sensory nerve) দেহের নিম্নাংশের খবর মস্তিষ্কে পৌঁছায় আবার Motor nerve মস্তিষ্কের সংকেত নিম্নাংশে নিয়ে যায়। তদ্রূপ স্রষ্টার বিশ্ব শাসন ব্যবস্থার কার্যক্রম এভাবে সম্পন্ন হয়।

এক্ষেত্রে শয়তান সৃষ্টি জগতের এমনি একটি বৈরী সত্তা যা আরশের নির্দেশ নিম্নজগতে পৌছতে বাঁধা সৃষ্টি করে। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রজ্জলিত উল্কাপিণ্ড শয়তানের দিকে মিসাইলের মতো ছুড়ে মারা হয়। এতে শয়তান তার মিশন সফল করতে পারে না।

"নিকটবর্তী আকাশকে রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে।" (৩৭ : ৭)

মানবদেহে যখন কোন অপারেশন করা হয় তখন শুধু ব্যথার অনুভূতি দূর করার জন্য Sensory ও Motor nerv-এর কার্যব্যবস্থা সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়। এক্ষেত্রে ঐ ভেষজ পদার্থ স্নায়ূর কার্যক্ষমতাতে বাঁধা সৃষ্টি করে, ফলে মস্তিষ্কে কোন ব্যথা অনুভব হয় না। এ ব্যবস্থাটি সাময়িক সময়ের জন্য চালু রাখা হয়। কিন্তু এটি দীর্ঘমেয়াদী হলে ঐ মানুষটির জন্য জীবন চালানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ সে পথে ঘাটে মারাত্মক আঘাত পেলেও ব্যথা পাবে না। ফলে আঘাতে আঘাতে ক্ষত হয়ে সে মারা যাবে। এক্ষেত্রে জাইলোকেইন ইনজেকশন ব্যবহার করে কোন নির্দিষ্ট স্থানের ব্যথার অনুভূতি সাময়িক সময়ের জন্য কমিয়ে রাখা হয়। মানুষ সারাদিন কাজ করার পর তাদের দেহেও এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হয়, যা মানুষকে ঘুম পাড়াতে সাহায্য করে। অপর দিকে মানুষের দেহে অনেক সময় এমন ব্যাধি দেখা দেয়, যার জন্য তার Sensory ও Motor nerve-এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। এ রকম একটি রোগের নাম হলো কুষ্ঠ। এটি জীবাণুর মাধ্যমেই হয়। স্রষ্টার নির্মিত প্রাকৃতিক বিধানের মধ্যে

www.pathagar.com

অদৃশ্য যেসব সত্তা আছে তন্মধ্যে "শয়তান" জীবাণু বা বর্জ্য জাতীয় অদৃশ্য সত্তা। সে চায় আ'রশের ব্যবস্থাপনাকে বন্ধ করে দিতে। ফলে শয়তান যখন তার মিশন সফল করতে উদ্যত হয় তখন তার দিকে প্রজ্জলিত অগ্নি পিণ্ডের মিশাইল ছুড়ে মারা হয়। আমরা যদি নিজের অস্তিত্ব ও নিজ দেহের কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারি, তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতিটি সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারব। তাই একজন বুযুর্গ বলেছেন–"যিনি নিজেকে চিনেছেন তিনি আল্লাহকে চিনেছেন।"

www.pathagar.com

আদমের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রাচীন কালের প্রচলিত ধারণা

যুগে যুগে মানুষ 'মানুষের আদি উৎস" সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেছে। ফলে কখনো মানুষ দ্বারস্ত হয়েছে ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের (ইঞ্জিল) দুয়ারে। আবার কখনো তাওরাত ও যবুরসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কাছে। কিন্তু এ সব ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায় যখনি মনে সংকট উদয় হয়েছে তখনি ফিরে গেছে দর্শন ও বিজ্ঞানের দিকে। তাই ধর্মগ্রন্থের আশ্রয়ে যেমন সৃষ্টি হয়েছে পৌরাণিক কাহিনী। তেমনি দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তৈরী হয়েছে মনগড়া মতবাদ। ফলে এসব মতবাদ বা বিভ্রান্তিকর কাহিনী পাঠক মহলের কাছে তুলে ধরে তার পর্যালোচনার গুরুত্ব অনুধাবন করছি বিধায় নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো।

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ্য নির্মাণ করি। আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে পশুদের উপরে কতৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতি মূর্তিতেই মানুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরের প্রতি মূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।" (পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম)

"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মানুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়। আমি তাহার জন্য অনুরূপ সহকারিনী নির্মাণ করি। আর সদা প্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্মাণ করিলেন। পরে আদম তাহাদের কি নাম রাখিলেন। তাহা জানিতে সে সকলকে তাঁহার নিকট আনিলেন, তাহাতে আদম যে সজীব প্রাণীর যেই নাম রাখিলেন, তাহার সে নাম হইল। আদম যাবতীয় গ্রাম্য পশুর ও খেচর পক্ষীর ও যাবতীয় বন্য পশুর নাম রাখিলেন। কিন্তু মনুষ্যের জন্য তাহার সহকারিণী পাওয়া গেল না। পরে সদা প্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে, তিনি নিদ্রিত হইলেন। আর তিনি তাহার একখানা পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সে স্থান পুরাইলেন। সদা প্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক

www.pathagar.com

স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাহাকে আদমের নিকট আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার (হইয়াছে) ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস ইহার নাম নারী হইবে। কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন। এই কারণে মনুষ্য আপন পিতা-মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে। ঐ সময়ে আদম ও তাহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিতেন। আর তাহাদের লজ্জাবোধ ছিল না।" (পুরাতন বাইবেল, পুরাতন (তাওরাত জবুর) ও নতুন নিয়ম (ইঞ্জিল) দ্বিতীয় অধ্যায়, বাণী ১৮-২৫)

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম হলো তাওরাত ও জবুর এবং নতুন নিয়ম হলো ইঞ্জিল শরীফ। বিভিন্ন সময়ে এগুলোর সংস্করণ হয়েছে। এর ফলে নতুন সংস্করণের রচয়িতাগণ নিজেদের কিছু মনগড়া পৌরাণিক কাহিনী এতে জুড়ে দিয়েছেন। কারণ কঠোরভাবে সংরক্ষণ ও সংস্করণের অভাবে এগুলোতে যখনি প্রচলিত ধারণা ঢুকে গেছে তখনি গীর্জার পাদ্রীগণ নতুন সংস্করণ বের করেছেন। এ সময় তারা নিজেদের জানা কিছু তথ্য এবং লোক মুখে শ্রুতি কাহিনী পরিমার্জিত করে নিয়ে নতুন সংকলন বের করেছেন। এর ফলে বাইবেলের অনেক তথ্যই বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। আল-কোরআনে মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টির কথা বলা আছে। আবার মাটির কথাও বলা আছে। এ থেকে বিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু বাইবেলে শুধু মৃত্তিকার কথা বলা আছে। পানির কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া আদমের বুকের পাজরের অস্থির দ্বারা তার স্ত্রীকে সৃষ্টির কথা বলা আছে, যা আল-কোরআনে কোথাও নেই। আবার এ তথ্যের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আদি এককোষী জীবকোষ বিভাজনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের ন্যায় দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে আদম ও হাওয়ার আবির্ভাব হয়েছে। এটা হলো জড়দেহ গঠনের প্রক্রিয়ার কথা। আবার আত্মিক পর্যায়েও আত্মিক বিভাজন সংগঠিত হয়ে আদম থেকে তার স্ত্রীর (সহকারিণী) আত্মা পয়দা হয়। কারণ মানুষের রয়েছে আত্মিক ও দৈহিক পরিচয়। এক্ষেত্রে আত্মাই মূল সত্তা।

আল-কোরআন এবং আল-হাদীসের সংরক্ষণ নীতিমালা খুব কঠোর। এক্ষেত্রে একটা দাড়ি, কমা জুড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। তবে ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ বা তফসিরের ক্ষেত্রে অনেকেই প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী তাদের লেখা ধর্মীয় গ্রন্থ বা তফসির গ্রন্থে "কিতাবে উল্লেখ" আছে বলে জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেটি কোন কিতাবে উল্লেখ আছে, তার কোন বিবরণ দেননি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেসব তথ্য আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে আদম, হাওয়া ও শয়তানের আবির্ভাব সম্পর্কে রয়েছে ব্যাপক রূপক ব্যাখ্যা। যা মুসলমান হিসেবে আমরাও ধর্মের কথা বলে বিশ্বাস করছি। যেমন আদমের বুকের পাজরের অস্থি থেকে হাওয়ার সৃষ্টি। একথা আল-কোরআনে বা হাদীসে কোথাও উল্লেখ নেই। অপর দিকে আদমের জড় কাঠামো তৈরীর পৌরাণিক রূপক ব্যাখ্যাটিকে ধর্মের কথা বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব তথ্য সম্বলিত একটা গ্রন্থের নাম "আদম ও শয়তান"। আদমের জড়দেহ সৃষ্টির সম্পর্কে সে গ্রন্থের কিছু কথা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

"আল্লাহ পাক যখন আদমকে সৃষ্টি করার এরাদা করলেন তখন জমীনের প্রতি আল্লাহ খবর পাঠালেন, হে জমীন, আমি তোমার ধূলা দ্বারা ইনসান পয়দা করতে চাই। কিন্তু আমার শরীরের কিছু টুকরা দোজখে জ্বলবে, ইহা শুনে আমি দুঃখিত হয়েছি–এই বলে জমীন এত কাঁদতে লাগল যে, ইহাতে নদী প্রবাহিত হল। কথিত আছে যে, জমীন যদি না কাঁদত তবে মানুষ কেউ কারোও দুঃখে কাঁদত না।"

"তারপর আল্লাহ তাহার নিকটবর্তী ফিরিশতা জিব্রাইলকে হুকুম করলেন। হে জিব্রাইল! তুমি আমার হুকুম তামিল কর। এখনই জমীনে গিয়া এক মুষ্টি মাটি আন। এতে জমীন জার জার হয়ে রোদন করতে লাগল। এতে জিব্রাইল মাটি ফেলে দিয়ে চলে আসলেন। অতঃপর আজরাইল বলিলেন হে জমীন! তোমার কান্নাকাটি বেকার। আমি তোমার কোন ওজর আপত্তি শুনিব না। আমি আল্লাহর হুকুম তামিল করতে এসেছি। আজরাইলের এহেন কঠিন উক্তি শুনে জমীন কাঁদতে লাগল। ওদিকে আজরাইল বিসমিল্লাহ বলে তাঁর কঠিন মুষ্টিতে জমীনের সকল অংগ থেকে মাটি তুলে নিলেন।"

www.pathagar.com

"জমীনের মিশ্রিত মাটি খোদার দরবারে পেশ করা হল। তারপর আল্লাহ পাক সেই মাটিকে আরব দেশে ফেলে দিতে আজরাইলকে হুকুম দিলেন। আল্লাহ উহার উপর এক খন্ড মেঘ বর্ষণ করলেন। উহার উপর চল্লিশ বৎসর সেখানে বর্ষা পতিত হল। উহার পরে রাহিক এবং সলসাবীল নামক নহরের পানি দ্বারা সত্তর হাজার ফিরিশতা উহাকে ধৌত করলেন। তৎপর আল্লাহ পাক নিজের কুদরতে আদমের নকশা তৈরী করলেন। আল্লাহর কুদরতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব তৈরী হল।

"অতঃপর আল্লাহ সূর্যকে হুকুম করলেন, আদমের পুতুলকে শুকাতে। সূর্য উহাতে চল্লিশ বৎসর ধরে তাপ দিল। এই পুতুলের দৈর্ঘ্য ষাট গজ এবং প্রস্থ্য সাত গজ ছিল।"

"কেতাবে বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আ)-এর দেহ আরবের মক্কা এবং তায়েফের মধ্যে ওয়াদীয়ে মোকাম অর্থাৎ তায়েফের ময়দানে তৈরী করা হয়েছে।" (আদম ও শয়তান বইয়ের ২৩, ২৫, ২৬, ২৭ পৃষ্ঠার অংশ বিশেষ)

আদমের জড়দেহ গঠন সম্পর্কে আদম ও শয়তান বইয়ের লেখক যে কাহিনী তুলে ধরেছেন, তা রূপক এবং পৌরাণিক কাহিনীই বলে মনে হয়। কারণ আল-কোরআনের কোথাও আদমকে এভাবে তৈরী করার কোন ইঙ্গিত নেই। এমন কি কোন সহীহ হাদীস তালাশ করে এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে যেমন ঢুকেছে মনগড়া রূপক কাহিনী (প্রাচীনকালের প্রচলিত ধারণা) তেমনি আমাদের আকিদা ও বিশ্বাসে ঢুকে যাচ্ছে ধর্মের নামে মনগড়া তথ্য। যা কোরআন ও হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীস চিরদিন নির্ভুল অবস্থায় আছে এবং থাকবে। ধর্মীয় গ্রন্থের নাম ধরে কিছু লেখকের উদ্ভট চিন্তা সুকৌশলে আমাদের বিশ্বাসে ঢুকে পড়ছে। যা কুসংস্কার, বেদআত, ও ঈমানের পরিপন্থী। আল-কোরআনের সূরা আলে ইমরানের ৫৯ আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। তিনি তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করলেন। তৎপর বললেন, 'হও' ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল।"

বিবি মরিয়মের গর্ভে ঈসা (আ) কোন পুরুষ মানুষের সংস্পর্শ ছাড়াই পয়দা

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে শুক্রকীট মৃত্তিকার সারভাগ দিয়ে আল্লাহর 'হও' নির্দেশেই সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শুক্রকীট বিবি মরিয়মের ডিম্বানুকে নিষিক্ত করলে তা থেকে সন্তান পয়দা হয়। এ প্রক্রিয়া যে আদম (আ)-এর বেলায়ও প্রযোজ্য ছিল তার ইঙ্গিত উপরের আয়াত থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্ভট চিন্তার লেখকগণ কোরআন হাদীসের সাথে সঙ্গতি না রেখে যা লিখেছেন, এর দ্বারা বিজ্ঞানের সাথে যেমন সৃষ্টি করেছেন বিবাদ-কলহ। তেমনি ধর্মকে করেছেন কলুষিত। অথচ কোরআন হাদীসের তথ্য বিজ্ঞানের সাথে (বিজ্ঞানের তথ্য নির্ভুল হলে) কখনও সাংঘর্ষিক হবে না।

আল্লাহ পাক কোন কিছু পয়দা করার সময় শুধু বলেন, 'হও' তাতেই তা হয়ে যায়, এ কথা একশত ভাগ সত্য। এরপরও বলতে হয় আল্লাহ কোন কাজই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ঘটান না। যদি কখনও কোন বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চান, তখন এর জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থার আঞ্জাম করেন। তবে ঐ বিশেষ ব্যবস্থাটিও অবৈজ্ঞানিক হয় না। যেমন পিতা ছাড়া সন্তান জন্ম হওয়া প্রজনন রীতিতে অসম্ভব মনে হলেও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তা অবৈজ্ঞানিক নয়। আজকাল জেনেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং ও মানব ক্লোনিং সে ধরনের ব্যবস্থাপনারই একটা কৌশল। আদম (আ)কে পৃথিবীতে পাঠানোর ক্ষেত্রে স্রষ্টার যে পরিকল্পনা তা ঈসা (আ)-এর জন্ম পদ্ধতির অনুরূপ ছিল। সেজন্য আদম (আ)-এরও মা ছিল। কিন্তু তার কোন পিতা ছিল না। তবে আদম (আ) এর মা ছিল পশু শ্রেণীর মানব প্রজাতির মাতা। মৃত্তিকার সারভাগ থেকে আল্লাহর 'হও' নির্দেশে উৎপন্ন শুক্রকীট পশু শ্রেণীর বন্য মানুষের কোন মাতার ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলে, তা ঐ মাতৃথলিতেই বিভাজিত হয়ে আদম ও হাওয়ার জড়দেহ গঠিত হয়। এখানে 'একক জীব কোষ' এর মাধ্যমে ডিম্বাণুটি নিষিক্ত হলে সেটি বর্তমান প্রজনন প্রক্রিয়াতে বিভাজিত হয়ে একই মাতৃগর্ভ থেকে পরস্পরের সহধর্মীনি নর-নারী হিসেবে জন্ম হয়। সেই জড়দেহতে রূহ বা আত্মা প্রোথিত হয় আল্লাহর নির্দেশেই । আমরা যদি নিম্নে উল্লেখিত আয়াতের সাথে উপরের আয়াতটি মিলিয়ে দেখি তাহলে এ ধরনের তথ্যের সন্ধান পাব আশা করি।

www.pathagar.com

"সে বলেছিল (মরিয়ম), হে আমার প্রতিপালক, কিভাবে আমার পুত্র হবে? কোন মানুষ (পুরুষ) তো আমাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি বললেন এভাবেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কার্যের মনস্থ করেন, তখন তিনি 'হও' ব্যতীত বলেন না, ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়।" (সূরা আলে ইমরান : ৪৭)

ঈসা (আ) জন্ম দৃষ্টান্ত যেহেতু আদমের অনুরূপ। তাই আমাদেরকে আদম (আ)-এর জন্ম ঈসার অনুরূপ হয়েছিল- সে কথাই ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মাটি একত্র করে আদমের মূর্তি বানিয়ে তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়া ঈসার দৃষ্টান্তের অনুরূপ হয় না। ফলে এ ধরনের বিশ্বাস ধর্মের নামে চালিয়ে দেয়া কুসংস্কার ও বেদআত। হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ নিজ কুদরতি হাতে আদমকে পয়দা করেছেন। কিন্তু কোথাও ফিরিশতাগণ কর্তৃক বিভিন্ন দেশের মাটি নিয়ে আদমের মূর্তি তৈরীর ব্যাখ্যা কোন সহীহ হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। আত্মা এবং দেহ উভয়টি নিয়েই আদমের পরিচয়। আত্মা সৃষ্টি হয়েছে আত্মিক জগতে আর দেহ জড়জগতের তৈরী। মূলত আল্লাহ আদম সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি স্বীয় কুদরতি দৃষ্টির মাধ্যমেই সম্পন্ন করেছেন। নিম্নের হাদীসে কুদসীর ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাই বুঝা যায়-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তিনটি বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু সরাসরি নিজ হাতে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি যাবতীয় বস্তুকে বলেছেন 'হও' তাতেই উহা হয়ে যায়। আল্লাহ যখন আদম ও ফিরদাউসকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন এবং উহাকে (ফেরদাউসকে) বলেছেন, আমার ইযযত ও মর্যাদার শপথ! তোমার মধ্যে কোন কৃপণ আমার সান্নিধ্যে বাস করতে পারবে না। আর কোন নির্লজ্জ ব্যক্তি তোমার সুগন্ধ পাবে না।" (দায়লামী ইহা আলী (রা.)-র সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।)

আদম এবং হাওয়া পরস্পর পরস্পরের সঙ্গীনি। আদম থেকেই হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ায় জড় কাঠামো তৈরীর ক্ষেত্রে আদম এবং হাওয়ার প্রসঙ্গ একই সূত্রে গাঁথা। তাই পৃথিবীতে আদমের জড়দেহ যেমন

www.pathagar.com

পশু শ্রেণীর বন্য ও বর্বর মানুষের মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হয়েছে তেমনি হাওয়ার জড়দেহও অনুরূপ মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে পানির আদি এককোষী প্রাণী বিবর্তনের মাধ্যমে পশু শ্রেণীর মানুষে রূপান্তরিত হয়। তাই আদমের প্রজাতিতে পশু শ্রেণীর মানুষের গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। তাদেরকে নির্বাচিত মৃত্তিকার দ্বারা সৃষ্টি করে (শুক্রকীট) তা কোন এক মাতার সুরক্ষিত স্থানে (জরায়ুতে) শুক্র বিন্দু রূপেই সংস্থাপিত করে জন্ম দিয়েছেন। যেহেতু আদমের অস্তিত্ব থেকেই হাওয়াকে পয়দা করা হয়েছে, তাই বলা যায় তাদের উভয়ের জন্ম একই মাতৃগর্ভে, একই সময়ে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

আল্লাহ বলেন-

"(হে মানুষ, তোমরা সৃষ্টি প্রক্রিয়াটা লক্ষ্য করো), আমি মানুষকে মাটির মূল উপাদান থেকে পয়দা করেছি, অতঃপর তাকে আমি (শুক্রকীটের আকারে) একটি সংরক্ষিত জায়গায় (সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে) রেখে দিয়েছি। এরপর এই শুক্রবিন্দুকে আমি এক ফোটা জমাট রক্তে পরিণত করি, অতঃপর এই জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি, (কিছুদিন পর) এই পিণ্ডকে অস্তি পাজরে পরিণত করি, তারপর এক সময় এই অস্তি পাজরকে কিছু গোস্তের পোশাক পরিয়ে দেই, অতঃপর (বানানোর প্রক্রিয়াকে শেষ করে) আমি তাকে (সম্পূর্ণ) ভিন্ন এক সৃষ্টি (তথা মানুষ) রূপে পয়দা করি, আল্লাহ তায়ালা কতো উত্তম সৃষ্টিকর্তা, (কতো নিপুণ তার সৃষ্টি!) (সূরা মোমেনুন : আয়াত ১২-১৪)

"তোমরা ভয় কর সেই প্রভুকে যিনি এক আত্মা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সহধর্মিনীকে এবং সেই দুইজন (আদম এবং হাওয়া) হতে তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসা : ১)

এ অধ্যায়ের আলোচনার মধ্যে কোনটি কোরআন হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা যাচাই-বাচাই করার দায়িত্ব পাঠক মহলের হাতেই ছেড়ে দেয়া হল। আমি শুধু বলে যেতে চাই, আসুন আমরা প্রাচীনকালের অবৈজ্ঞানিক

www.pathagar.com

প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী পরিহার করে আল-কোরআনের বৈজ্ঞানিক ধারণাকে বিশ্বাস করি এবং কোরআনের পথে ফিরে আসি।

বিবর্তন কেন

মহান রাব্বুল আলামীন জগতের সমুদয় বস্তু এবং বস্তুর উপাদান, উদ্ভিদসমূহ, প্রাণী সকল, মানুষজন সবই সৃষ্টি করেছেন। একদিকে তিনি যেমন তাঁর বিধানের আনুগত্যশীলদের পালনকর্তা তেমনি তিনি তাঁর বিধানের বিরুদ্ধকারীদেরও পালনকর্তা। তিনি আস্তিক, নাস্তিক সকলকেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি এক সাথে সৃষ্টি করতে পারেন না, এমন কোন কাজ নেই। তবু তিনি জগতের সকল কিছু বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ বিবর্তন কেন? বর্তমান যুগের আধুনিক মানুষ কোন কিছুই অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে রাজি নয়। তারা বিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার রহস্য সম্পর্কে জানতে চায়। ফলে বিবর্তন কেন এর সম্ভাব্য জবাব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

বিবর্তনের ধারণা হলো মানুষসহ পৃথিবীর সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ নিম্নধাপের এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে চূড়ান্ত ধাপে এসেছে। তাই আমাদেরকে বিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জন্য এককোষী প্রাণীর গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানতে হবে। এককোষী একটি প্রাণী এক মিলিমিটারের সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র। এর গঠন প্রকৃতি খুব রহস্যময়। এতে রয়েছে সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াসসহ অন্যান্য উপাদান। অতঃপর এ নিউক্লিয়াসে রয়েছে ক্রোমোজম, যার মধ্যে 'জিন' নামক এক সূক্ষ্ম সত্তা বিদ্যমান। এটি জীবকোষের নিয়ন্ত্রক। প্রতিটি এককোষী প্রাণীই কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। কোষ বিভাজনের জন্য অনুঘটনের প্রক্রিয়াসহ কোষের রাসায়নিক পদার্থেই রয়েছে নিজে নিজে বিভক্ত হওয়ার মতো সকল উপাদান। যখন একটি কোষ বিভক্ত হয় তখন 'জিন' থেকে ঐ কোষের সকল উপাদানের কাছে তথ্য বা নির্দেশ প্রেরীত হয়। এ ক্ষেত্রে 'জিন' শুধু তথ্য প্রেরণেই করে না, বরং সে তথ্য গ্রহণও করে। মূলত কোষের তথ্য আদান-প্রদানের কাজটি করে ডি. এন. এ.

www.pathagar.com

নামক একটি জটিল উপাদান। এই ডি. এন. এ. আর. এন. এ. নামক আর একটি উপাদানের সাথে সম্পর্ক রেখে কাজ করে।

মূলত: এককোষী প্রাণীর এসব জটিল উপাদানগুলো সুসংগঠিত ও আনুপাতিক হারে নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করে। এ ধরনের এককোষী প্রাণীর মতো অসংখ্য জীবকোষ নিয়ে মানুষের জড়দেহ গঠিত। তাই মানুষের প্রতিটি জীবকোষের কার্যপদ্ধতি এককোষী প্রাণীর অনুরূপ। এতে বুঝা যায় মানব দেহের প্রতিটি কোষের প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত সুসংগঠিত রাখা এবং নির্দিষ্ট মাত্রা বা পরিমাণ ঠিক রাখাসহ নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপনের জন্যই বিবর্তন আবশ্যক ছিল।

বিবর্তন ছাড়া দেহের জৈব প্রক্রিয়া ঠিক রাখা কোন অবস্থায়ই সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের মাটি একত্র করে মূর্তি বানিয়ে আদমকে পয়দা করা হলে জীবকোষের মধ্যস্থিত এসব জটিল উপাদান সুসংগঠিত না হয়ে পরিমাণের দিক থেকে এলোমেলো থাকতো। ফলে আদমের দেহকোষের সাথে পৃথিবীর অন্য কোন জীবের দেহ কোষ সাদৃশ্যপূর্ণ হতো না। এর ফলে একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হতো। অর্থাৎ আদম জাতিকে না খেয়ে মরতে হতো।

কারণ আদম এবং তার প্রজাতি বিবর্তিত না হয়ে উদ্ভব হলে, তাদের দেহ কোষের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য জীবের দেহ কোষের মিল থাকতো না বিধায় তারা নিম্ন শ্রেণীর হালাল প্রাণীর গোশত খেয়ে সহজে হজম করতে পারতো না। ফলে উভয়ের দেহ কোষের অমিলের জন্য আদম জাতের দুনিয়ায় চলা ছিল দুস্কর। কারণ পৃথিবীতে বাস করলেও এখানকার কোন কিছু খেয়ে হজম করতে পারতো না। পিপাসায় এক গ্লাস পানি খেলেই ডায়রিয়ার মতো বেরাম হয়ে মরে যেতে হতো। আবার অবৈজ্ঞানিক পন্থায় বিভিন্ন দেশের মাটি একত্র করে আদমকে তৈরী করা হলে কোথাও বেশী মাটি, কোথাও কম মাটি পড়ত। অপর দিকে দেহ কোষের পরস্পরের সাথে তথ্যের আদান প্রদান সম্ভব হতো না। তাই আল্লাহ সৃষ্টির প্রতিটি রেণু কণা পর্যন্ত পরিমাণ ও অনুপাত ঠিক রেখেছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন- "সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে পরিমাণে ও অনুপাতে।" (৫৪ : ৫০)

শুধু শুধু পরিমাণ ও অনুপাত বজায় রেখে আকার সৃষ্টি করলে প্রাণী পূর্ণতা লাভ করে না। সৃষ্টির পূর্ণতার জন্য তার প্রকৃতি বা স্বভাব নির্ধারিত করতে হয়। প্রাণীর স্বভাবের উপর নির্ভর করে প্রকৃতিতে টিকে থাকা না থাকার সাফল্য। উঁই পোকার পাখা গজালে তারা আগুনে ঝাপ দিয়ে পুড়ে মরে। উঁই পোকার এই স্বভাবের জন্য তারা প্রকৃতিতে টিকে থাকতে পারে না। শিয়াল ও কুকুর দেখতে খুব তফাৎ না হলেও কুকুর থাকে মালিকের ঘরে, আর শিয়াল থাকে জঙ্গলে। স্বভাবের ভিন্নতার জন্য দু'টি প্রাণীর দুই জাগায় বাস করতে হচ্ছে। এখানে শিয়ালের স্বভাব হলো মালিকের পোষা মোরগ-মুরগী, ছাগল ইত্যাদি ধরে খাওয়া আর কুকুরের স্বভাব হলো এগুলোকে পাহারা দিয়ে রাখা। স্বভাবের এই ভিন্নতার জন্য শিয়াল মালিকের তাড়া খেয়ে জঙ্গলে বাস করে। আর কুকুরকে মালিক খাবার দাবার দিয়ে পোষে রাখে। স্বভাবের এই গুণাগুণগুলো ডি. এন. এ. কোড বহন করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে টিকে থাকার আন্দোলনে প্রাণীর স্বভাবের বিচিত্রতা ডি.এন.এ কোডগুলোই বংশানুক্রমিকভাবে বহন করে নিয়ে আসে নতুন প্রজন্মের কাছে। মানুষের মাঝে রয়েছে পশুর স্বভাব, রয়েছে শয়তানের স্বভাব ও ফিরিশতার স্বভাব। আরও রয়েছে স্রষ্টার প্রদত্ত জ্ঞান। মানুষের মাঝে স্রষ্টা প্রদত্ত যে জ্ঞান রয়েছে তা অন্য কোন জীবে নেই। আল্লাহ মানুষকে উপরের সকল গুণের সমন্বয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষের মাঝে পশু শ্রেণীর স্বভাব সংযোগ করতে গিয়ে তাদেরকে পশু শ্রেণী মানুষ থেকে উদ্ভব ঘটিয়েছেন। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় আধুনিক মানুষ যদি পশুর শ্রেণীর মানুষ থেকে বিবর্তিত না হয়ে সৃষ্টি হতো তাহলে তার মধ্যে পশুর কোন স্বভাবই থাকত না। আবার তাদের মাঝে ফিরিশতার ন্যায় উত্তম ব্যবহার থাকত না। এ ক্ষেত্রে প্রতিয়মান হয় যে, মানুষের মাঝে সকল ব্যবহারের সমন্বয় ঘটানোর জন্যই বিবর্তন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আদমকে যদি মাটির মূর্তি বানিয়ে সৃষ্টি করা হত তাহলে তার মাঝে হয় পশুর ব্যবহারই থাকত, না হয় শুধু ফিরিশতার ব্যবহার থাকত। কিংবা অন্য গুণাগুণগুলো যে কোন একটি বিদ্যমান থাকত।

www.pathagar.com

মানুষের মাঝে রয়েছে খাওয়া-দাওয়া, পয়ঃনিষ্কাশন, যৌনক্ষুধা, ঘুম-নিদ্রা, আরাম-আয়েশ, রোগ-বালাই ইত্যাদি স্বভাব। এ রকম স্বভাব অন্যান্য যে কোন জীবের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃতির এ নিয়মগুলো মানুষের মাঝে এসেছে পশু থেকে। আবার মানুষের মাঝে রয়েছে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, মারামারি, রক্তারক্তির স্বভাব। এসব শয়তানী স্বভাব। আদমকে শয়তান হিংসা করেছিল। সে আগুনের তৈরী আর আদম মাটির তৈরী। অপর দিকে মানুষের সাথে থাকে একটা বড় জিন শয়তান। তাই মানুষের মাঝে রয়েছে শয়তানী স্বভাব। তাছাড়া মানুষের প্রতিটি কোষ-কলার পরতে পরতে রয়েছে শয়তানী সত্তার অস্তিত্ব।

আল কোরআনে শয়তানের নাফরমানীর কথা এসেছে– "আমি আদম হতে শ্রেষ্ঠ। আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।" (আল কুরআন)

"শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, সেই শয়তান হতে তোমরা সর্বদা বেঁচে থাকবে।" (আল- কোরআন)

অপর দিকে মানুষ পর-উপকারী, অপরের কাজে সাহায্যকারী। নিজের লাভের কথা চিন্তা না করে অপরের দুঃখে এগিয়ে যায়, স্রষ্টার আনুগত্য করে। স্রষ্টার বিধান মেনে চলে। কখনো আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কাজ করে না। এসব গুণ হলো ফেরেশতার স্বভাব। কারণ ফেরেশতার মাঝে রয়েছে আল্লাহর হুকুম মানা ও আনুগত্য করার গুণ।

আল্লাহ বলেন– "তারা কখনও আল্লাহ যা হুকুম করেন, তা লংঘন করে না এবং যা আদেশ করেন তাই পালন করে।" (আল কোরআন)

মানুষের মাঝে ৪র্থ যে গুণ রয়েছে তা হলো খোদায়ী ইলম বা জ্ঞান। এ জ্ঞান আছে বলেই মানুষ সৃষ্টির রহস্য তালাশ করে। স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে। অতঃপর রয়েছে আবিষ্কার বা সৃষ্টি করার ব্যাকুলতা, পাশাপাশি রয়েছে নিজকে প্রকাশ করার মানসিকতা। তাই বলা যায় মানুষের মাঝে চারটি গুণের সমন্বয় ঘটানোর জন্যই বিবর্তন প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ বলেন– "আল্লাহ যাকে জ্ঞান দান করেছেন; তাকে অশেষ কল্যাণ দান করেছেন।" (আল কোরআন)

www.pathagar.com

অতঃপর মানুষের খাদ্যের যে উৎস রয়েছে, সেই উৎসের সাথে মানুষের দেহের কোষ কলার সাদৃশ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বিবর্তন ছাড়া অন্য কোন পন্থা ছিল না। এ ক্ষেত্রে মানুষ বিবর্তিত হয়ে উদ্ভব হয়েছে বলেই পৃথিবীর জীব, উদ্ভিদ, আলো বাতাস, রোগ-বালাইর সাথে সম্পর্কিত। ফলে প্রকৃতি ও প্রকৃতির সকল উপাদানের সাথে মানুষ খাপ খাইয়ে চলতে পারছে।

উপসংহারে বলা যায় এ বিবর্তন ডারউইনের বিবর্তন নয়। মানুষ যে বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে তা হলো স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন। তাই মানুষের মাঝে এক সাথে চারটি গুণের সমন্বয় ঘটেছে। এক্ষেত্রে মানুষ যদি শুধু ডারউইনের বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভব হতো তাহলে তার মাঝে খোদায়ী ইলম থাকত না। তাদের মাঝে থাকত শুধু পশুর স্বভাব। সুতরাং বলা যায় প্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিয়ম, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্কশীল, প্রাণী জগতের শ্রেষ্ঠ প্রজাতি বিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ উদ্ভব ঘটান।

www.pathagar.com

আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের পরীক্ষা

মানুষের প্রাণবায়ূ বের হয়ে গেলে আমরা বলি লোকটি মারা গেছে। সে আর দুনিয়াতে নেই। এ কথার অর্থ এই নয় যে, তার জড় দেহও দুনিয়াতে নেই। মূলত: জড় দেহের মাধ্যমেই মানুষের একমাত্র পরিচয় দেয়া হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে আসল মানুষ হলো তার রূহ বা আত্মা। আত্মা বা রূহ আসে রূহানী জগত থেকে। আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের জড়দেহ দুনিয়ায় পয়দা করার পাশাপাশি রূহ সরাসরি না পাঠিয়ে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দুনিয়ার কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে পাঠানো হয়। এ পরীক্ষাটি শয়তান ও গন্ধম বৃক্ষের পরীক্ষা। এ পরীক্ষাটি নেয়া হয় বেহেশতে। যাকে দিয়ে আদম ও হাওয়ার সঠিক পরিচয় দেয়া যায়। সে প্রাণ বায়ু চলে গেলে বলা হয় সে আর দুনিয়াতে নেই। এ পরীক্ষাটি নেয়া হয় সেই আত্মিক আদম ও হাওয়ার ক্ষেত্রে। আদম-এর সৃষ্টি প্রক্রিয়া শেষ করে আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে বললেন, আদমকে সেজদা করার জন্য। সকল ফিরিশতা আদমকে সেজদা করলেও ইবলিস আদমকে সেজদা করেনি।

"আমরা তোমাদেরকে নির্মাণ করে ইহার ওপর আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি গঠনাকৃতি। উহার পর আমরা ফিরিশতাদেরকে বলেছি সেজদা কর আদমকে। (সূরা ৭ : ১১)

'যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম, সেজদায় পতিত হও আদমের সম্মুখে। তখন সকলেই সেজদায় পতিত হলো ইবলীস ব্যতীত। সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করল এবং অহংকার করল।' (সূরা বাকারা : ৩৪)

"শয়তান বলল, আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও। আল্লাহ বললেন যে, তোমার জন্য অবকাশ। ইবলিশ বলল, তুমি যখন আমার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছ, তখন তোমার বান্দাদেরকে সিরাতুল মুসতাকিম হতে বিচ্যুত করবার জন্য ওঁৎ পেতে থাকব। তারপর সামনে হতে, পেছন হতে, ডান হতে, বাম হতে আক্রমন করব। সুতরাং তুমি দেখবে তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে। আল্লাহ ইবলিসকে বললেন, এখান হতে ঘৃণিত

www.pathagar.com

এবং বিতাড়িত হয়ে যা। যারা তোর অনুগত হবে তাদের সকলের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (সূরা হিজর)

আর যখন আপনার প্রতিপালক বললেন ফিরিশতাগণকে, নিশ্চয়ই আমি পয়দা করব দুনিয়ার মধ্যে একজন প্রতিনিধি। (সূরা বাকারা, আয়াত-৩০)

আল্লাহ পৃথিবীতে আদমকে নিজের প্রতিনিধি করে পাঠাবেন। কিন্তু আদমের পিছনে যে শয়তান লেগে আছে সে কথা হয়ত তাঁদের জানা ছিল না। ইবলিস আদমকে সেজদা না করায় চির অভিশপ্ত হয়ে গেল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আদমকে সকল দিক থেকে আক্রমন করে জাহান্নামী বানাবে। যেহেতু আদমের এ বিষয়টি জানা ছিল না। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগেই অবগত করানোর ব্যবস্থা করলেন। শিক্ষার সে পদ্ধতিটি কানে কানে বলে না দিয়ে বাস্তবে শয়তানের মুখোমুখি করে বাস্তব জ্ঞান দিয়ে দিলেন।

'আর আমি বললাম হে আদম! বসবাস করতে থাক তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেস্তে এবং উভয়ে খাও উহা হতে স্বাচ্ছন্দে যথা হতে ইচ্ছা এবং কাছেও যেও না এই বৃক্ষটির। অন্যথায় তোমরাও হয়ে যাবে জালেমদের শ্রেণীভুক্ত। অনন্তর পদস্খলিত করে দিল শয়তান তাদেরকে ঐ বৃক্ষের কারণে। অনন্তর বের করে চাড়ল তাদেরকে সে সুখ-শান্তি হতে যাতে তারা ছিলেন। আর আমি বললাম, তোমরা বেহেস্ত হতে নেমে যাও। এই অবস্থায় যে তোমরা কতিপয় কতিপয়ের শত্রু।' (সূরা বাকারা : ৩৫)

অনেকেই মনে করেন, আদম (আ)কে এই পরীক্ষায় ফেলে পৃথিবীতে পাঠানোর কি প্রয়োজন ছিল? এর অর্ন্তর্নিহিত কারণ কি? মূলত এ পরীক্ষার মাধ্যমে একদিকে মানুষের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতার কথা জানিয়ে দেয়া হলো। অপরদিকে শয়তান যে মানুষের পরম শত্রু সে শিক্ষা দিয়ে দেয়া হলো। সাথে সাথে শয়তানের ধোকায় পড়লে বেহেস্তে যে যাওয়া যাবে না তাও বুঝিয়ে দেয়া হলো এবং এর পরিণাম কি হবে তাও জানিয়ে দেয়া হলো। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা অথবা কোন কাজ করার ক্ষেত্রে যার স্বাধীনতা নেই তাকে কাজের কর্মফল ভোগ করা বা তাকে শাস্তি দেয়া

www.pathagar.com

ন্যায়-নীতির খেলাফ। আবার ঐ কাজের জন্য পুরস্কার দেয়াও অর্থহীন। বাস্তব ক্ষেত্রে শুধু নিজের ইচ্ছা প্রণোদিত কর্মের জন্যই শাস্তি কিংবা পুরস্কার পাওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। সে জন্য আদম জাতের যে ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে তা জানানো অপরিহার্য ছিল। মানুষ ইচ্ছা করলে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মানতে পারে। কিংবা নাও মানতে পারে। এখানে না মানলে কি হবে তাও জানানো অবশ্যক ছিল। আদম (আ)কে দুনিয়ায় আল্লাহ নিজের প্রতিনিধি করে পাঠাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির কাজ বুঝিয়ে দেয়াও প্রয়োজন পড়ে। অপর দিকে বর্তমানে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দেয়া প্রদত্ত জীবন বিধান মানুষকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এ কাজটি করেন এই অর্থে যে কাউকে শাস্তি কিংবা পুরস্কার দেয়ার আগে প্রথমতঃ তাকে চলার স্বাধীনতা দিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁর জীবন বিধান সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে হয়। তা না করে বিচারের ব্যবস্থা করলে ন্যায়-নীতির খেলাফ হয়ে যায়। কিন্তু আদম (আ) এবং বিবি হাওয়াই যেহেতু পৃথিবীর প্রথম খেলাফতধারী মানব- মানবী, সুতরাং তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী রাসূল আনবেন কোত্থেকে? তাই দুনিয়ায় পাঠানোর আগেই তাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুনিয়ার জীবন বিধান সম্পর্কে জানানো হলো। সে পরীক্ষাটি হলো আদম ও বিবি হাওয়ার গন্ধম বৃক্ষের পরীক্ষা। মূলতঃ এই পরীক্ষাটির পিছনে ছিল মহৎ উদ্দেশ্য। এটি কোন তামাশা বা ফাঁদে ফেলার কৌশল নয়। যেহেতু দুনিয়াতে আদমের আগে আর কোন খেলাফতধারী মানুষ ছিল না, তাই এই পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত জ্ঞান দিয়ে তাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হলো।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় শয়তান না থাকলে ভাল হতো। কিন্তু পুরস্কার দেয়ার বেলায় কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও পরীক্ষার মুখোমুখী না করে পুরস্কার দেয়াও অর্থহীন। সে কারণে সৃষ্টির সম্প্রসারণ ও সৃষ্টিকে মূলের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য এবং মানুষকে পরীক্ষার মুখোমুখি করার জন্যই শয়তান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই আদম (আ)কে দুনিয়ায় পাঠানোর আগে ফিরিশতাগণকে জানানো হলো এবং তাঁকে সেজদা করতে নির্দেশ দিয়েছিলো। অতঃপর আদম (আ) ও গন্ধম বৃক্ষের পরীক্ষাকে খেলাফতের প্রাথমিক শিক্ষাও বলা চলে।

www.pathagar.com

মানুষ ও মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি

সুন্দর আকাশ, তারার মেলা, সবুজ শ্যামল পৃথিবী, অগণিত জীব-জন্তু আর পশু-পাখির নানা প্রজাতিতে ভরপুর আমাদের এই আবাসভূমি। এই সুন্দর পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি কি হবে? পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী উন্নতর জীব মানুষের গন্তব্যের শেষ ঠিকানা কোথায়? এ ধরনের প্রশ্ন মানুষের স্বভাব সুলভ আচরণ থেকেই উৎপত্তি হয়। মানুষ ভাবে এই সুন্দর মহাবিশ্বে রাতের আকাশে তারার মেলা আর কতকাল বসবে? আমরা যে পৃথিবীর বাসিন্দা সেটা যেমন শূন্যে সন্তরণ করছে তেমনি গতির জগতের সকল ছায়াপথ ও গ্যালাক্সিসহ সকল গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রগুলো শূন্যেই সাঁতরাচ্ছে। এগুলো কি অনন্ত কাল পর্যন্ত সন্তরণ করতেই থাকবে? তাদের গতি কি কখনো থামবে না?

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বস্তু গতি ও সময়ের উৎপত্তি একই সময়ে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ অনাদিকাল থেকে এগুলো বিরাজ করেনি। সে অর্থে যার শুরু বা আরম্ভ আছে, তার গতির স্থিরতা থাকবে। অর্থাৎ সেটি একদিন না একদিন থামবে এটাই নিয়ম। বিজ্ঞানে অনিশ্চিয়তাবাদ বলে একটা তথ্য আছে–সে তথ্যের মর্মার্থ হলো এ বিশ্ব ক্রমেই একটা সুশৃংখল অবস্থা থেকে বিশৃংখল অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ আদি বিশ্বের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ রূপে সুশৃংখল। তখন ছিল পরমস্থিতিকাল, কালক্রমে পরমগতি এবং আপেক্ষিক গতির সাথে সাথে বস্তু ও সময়ের সূচনা হলে বিশ্বের অবস্থা ক্রমেই বিশৃংখলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই বিশৃংখল অবস্থা একদিন মহা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হবে। তখন বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য। এই ধ্বংস হওয়াতেই কি বিশ্বের শেষ পরিণতি মিটে যাবে? থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে এই বিশ্বে ঠান্ডা ও তাপের ক্ষেত্রে যে বিনিময় চলছে, তাতে একদিন না একদিন তাপ সমতা দেখা দেবে। ফলে সকল জীবনী প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে সকল কিছুর মৃত্যু ঘটবে। এমন কি সূর্যেরও মৃত্যু ঘটবে। এতে গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রগুলো কক্ষচ্যুত হয়ে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এভাবে গতির জগতের সকল কিছু চুরমার হয়ে তুলার মতো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

পাক কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেছেন– "যখন সূর্যকে সঙ্কুচিত করা হবে এবং নক্ষত্রপুঞ্জ নিস্প্রভ হবে এবং যখন পর্বতমালা বিচলিত হবে।" (৮১ : ১-৩)

"সে দিন আকাশ গলিত তামার মত হবে এবং পর্বতসমূহ ধুনা পশমের মত হবে।" (১০১ : ৫)

"সেদিন আমি আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নেব যেভাবে কিতাবসমূহকে গুটিয়ে নেয়া হয়, যেরূপ আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম তদ্রূপ ইহার পরেও করব, ইহাই আমার ওয়াদা; নিশ্চয়ই আমি উহা সংঘটিত করব।" (২১ : ১০৪)

"অনন্তর যখন নক্ষত্রপুঞ্জ নিস্প্রভ হবে এবং যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যখন পর্বতসমূহ উৎক্ষিপ্ত হবে।" (৭৭ : ৮-৯)

www.pathagar.com

"এবং চন্দ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে, সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে।" (৭৫ : ৮-৯)

মহাবিশ্বের মহাবিশৃঙ্খল অবস্থাটা কখন আসবে? এ প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যার আগে আমাদেরকে বস্তু কি এবং তার থেকে কি উৎপন্ন হয় তা জানা প্রয়োজন। কারণ যে জিনিস ধ্বংস হবে তার গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত না হলে সে সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়া যাবে না। আমরা যেখানে বাস করি সেটা বস্তুর জগৎ। বস্তুর ভেতরে পর্যায়ক্রমে বাস করে অণু-পরমাণু-ইলেকট্রন; প্রোটন ও নিউট্রন। তারপর ফোটন➡কোয়ার্ক➡Information Bit বা তথ্যকণা। এ ধারণা থেকে জানা যায় মহাবিশ্বের একটি এককোষী প্রাণীর মধ্যেও যে তথ্যকণা রয়েছে তা দিয়ে ৫০০ পৃষ্ঠার ৮০টি পুস্তক পর্যন্ত লেখা সম্ভব। সে হিসেবে একটি পূর্ণ মানুষের দেহে যতগুলো তথ্যকণা আছে তা পৃথিবীর সমস্ত পুস্তকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথবা একটি লবনের সূক্ষ্ম কণায় যে পরিমাণ তথ্য মওজুদ থাকে তা ধারণ করতে প্রায় হাজারটি মস্তিষ্কের প্রয়োজন হবে। সে অর্থে জগতের তাবৎ জিনিস তথ্য কণার সারিবদ্ধ ভাণ্ডার। এখানে তথ্য কণার অন্তর্নিহিত রূপ হলো- তরঙ্গগতি+তথ্য = তথ্যকণা বা তথ্যতরঙ্গ অথবা তথ্য কাঠামো। আমরা লেখার সময় কলম দিয়ে কাগজে লিখে যে কোন তথ্য পুরে দেই। চিঠির বিভিন্ন অংশ আলাদা করলে আমরা পাব কাগজ+কালি+তথ্য। অপর দিকে লেখার সময় কলমটি গতিশীল করেই লেখার কাজ সম্পূর্ণ করতে হয়। অর্থাৎ কলম স্থির রেখে লেখার কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সে হিসেবে বস্তুর ভেতর থেকে যদি গতি আলাদা করা বা গতিকে যদি স্থির করে ফেলা হয় তবে সেখানে চলমান তরঙ্গের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। অতঃপর স্থিতি অবস্থায় তথ্যেরও কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। মূলতঃ বস্তুর মূল অবস্থা বা কাঠামো টিকে থাকার সহায়ক মাধ্যম হলো "গতি"। তাই মহাপ্রলয় বা কিয়ামতের সূচনা হবে মহাবিশ্ব স্থির হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। এর ফলে মুহূর্তে গ্রহ, নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতির ফলে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে। একটা চলন্ত গাড়ী হঠাৎ স্থির হয়ে গেলে গাড়ীর যাত্রীরা যেমন ধাক্কা অনুভব করে তেমনি জগৎময় মহাপ্রলয়ের মহুর্তে ধাক্কা বা ঝাঁকুনি অনুভব করবে।

আল্লাহ বলেন- "যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা বা ঝাঁকুনি দেবে এবং তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা। কতক হৃদয় সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে। দৃষ্টি হবে তাদের ভীত-বিহ্বল।" (সূরা আন নাযিয়াত : আয়াত ৬-৯)

সে হিসেবে মহাবিশ্বের রয়েছে কয়েকটি স্তর। যেমন পরম স্থিতি জগৎ, পরম গতির জগৎ, আপেক্ষিক গতির জগৎ এবং স্থিতি জগৎ। আপেক্ষিক গতির জগতের বিকীর্ণ সত্তার মাধ্যমে স্থিতি জগৎ ক্রমেই সম্প্রসারণ হচ্ছে। মূলতঃ কিয়ামত বা মহা প্রলয়ের মাধ্যমে আপেক্ষিক গতির জগতের বিনাশ ঘটবে।

www.pathagar.com

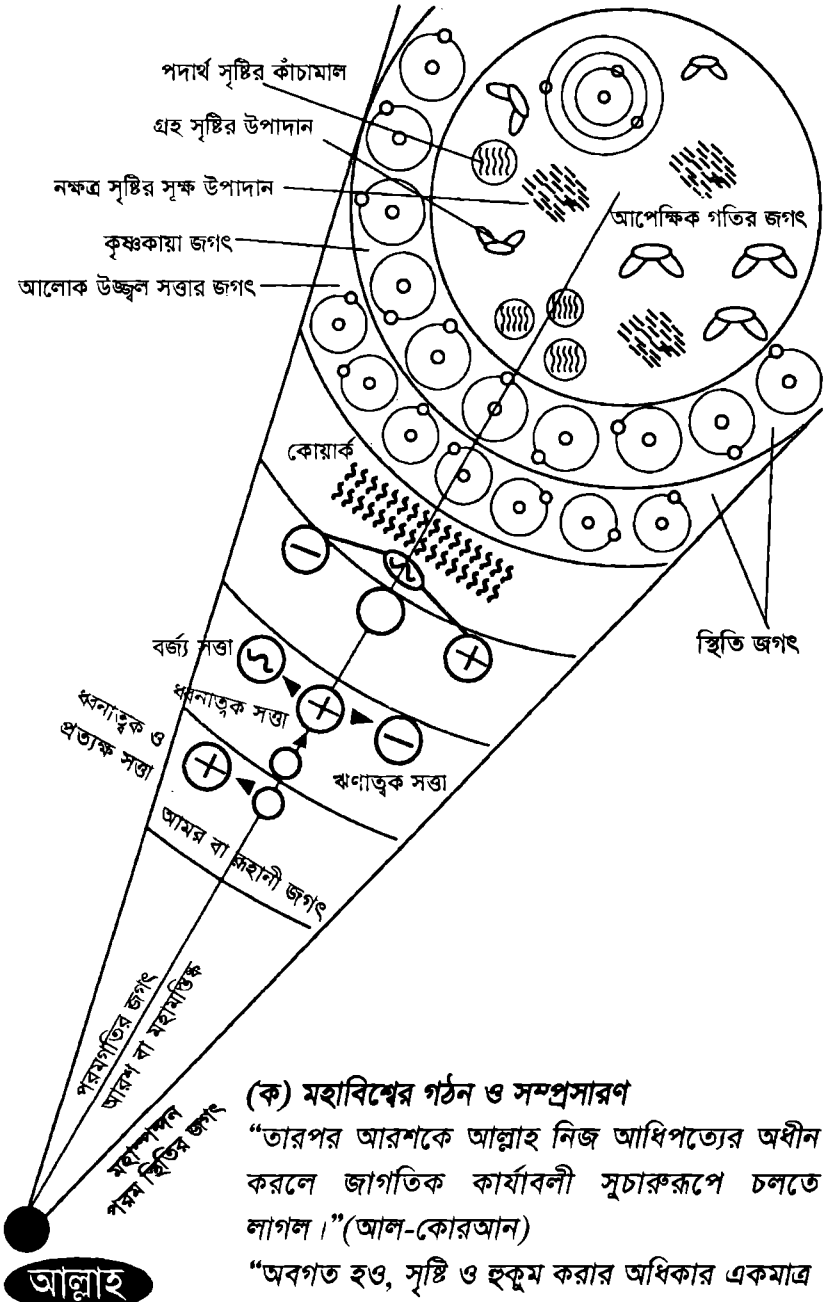

(ক) মহাবিশ্বের গঠন ও সম্প্রসারণ

"তারপর আরশকে আল্লাহ নিজ আধিপত্যের অধীন করলে জাগতিক কার্যাবলী সুচারুরূপে চলতে লাগল।"(আল-কোরআন)

"অবগত হও, সৃষ্টি ও হুকুম করার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে।" (আল-কোরআন)

www.pathagar.com

(খ) মানুষের পাপ মোচনের প্রক্রিয়া

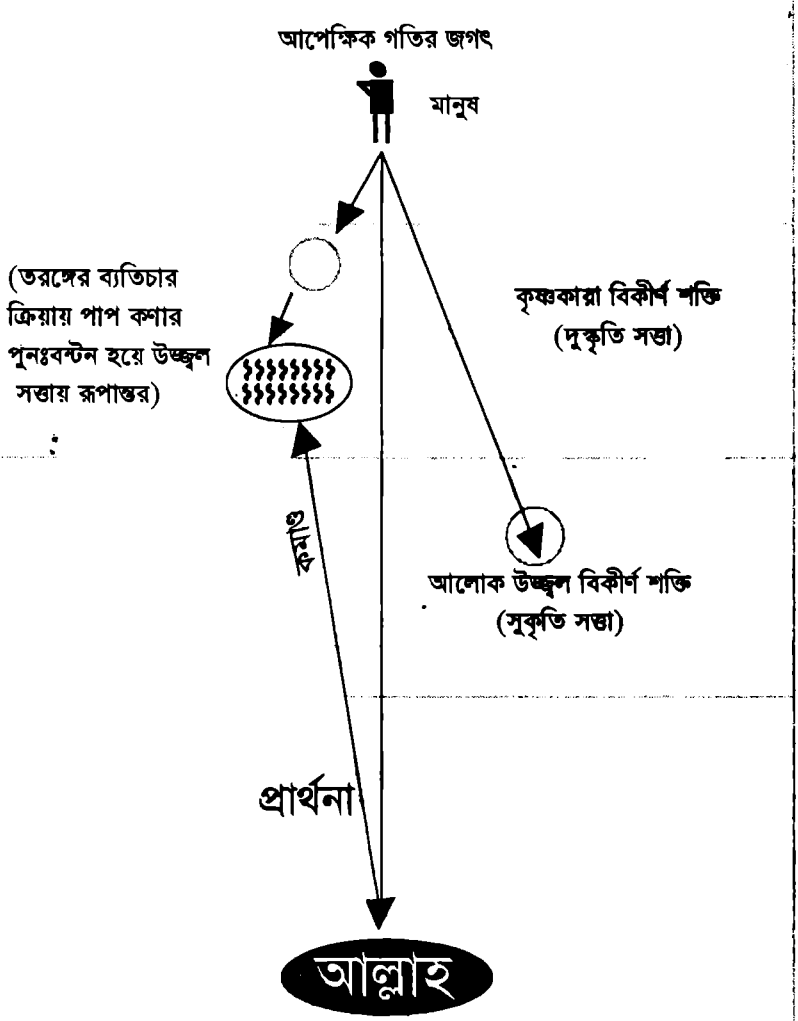

"সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃত প্রতিটি সুকৃতি ও দুস্কৃতি দেখতে পাবে।" (আলে-ইমরান : ৩০)

"তোমরা নিজেদের জন্যে এ দুনিয়া থেকে যেসব নেকী পাঠাবে আল্লাহর কাছে গিয়ে ঠিক তাই পাবে।" (আল-বাকারা : ১১০)

"পাপ ও পুণ্য দু'টো সৃষ্ট বস্তু" (আল-হাদীস)

www.pathagar.com

(গ) মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্তরসমূহ

পজেটিভ ডাইমেশন বা বস্তুর জগৎ (আপেক্ষিক গতির জগৎ)

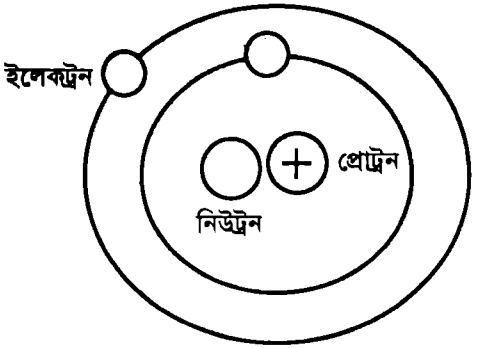

সম্প্রসারণশীল প্রতিবস্তুর জগৎ
(Antimatter) বা
নেগিটিভ ডাইমেশনের জগৎ
(Negative Dimension)

স্থির জগৎ

পরমগতির জগৎ
(ভবিষ্যতে পরমগতির জগতেরও বিলুপ্তি ঘটবে)

পরমস্থিতির জগৎ

"যেদিন জমীন ও আসমানকে পরিবর্তন করে অন্যরূপ করে দেয়া হবে।"
(সূরা ইবরাহীম)

www.pathagar.com

(ঘ) আপেক্ষিক গতির জগৎ ধ্বংসের প্রক্রিয়া

আপেক্ষিক গতির জগৎ
(আলমে খাল্‌ক বা সৃষ্টিজগৎ)

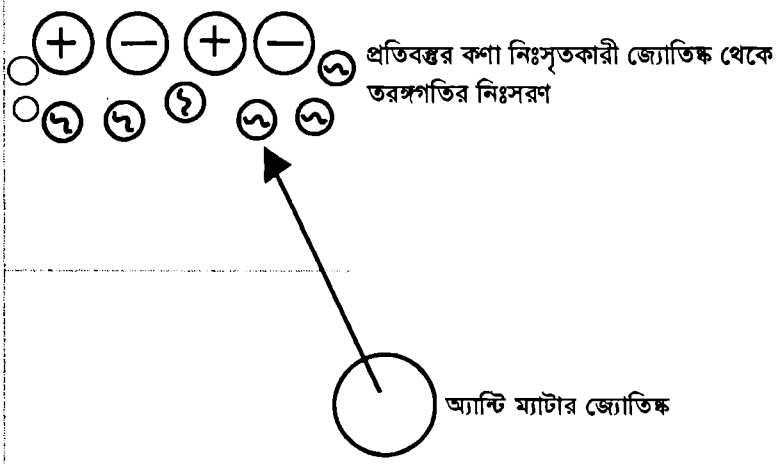

পরমগতির জগৎ
(আলমে আমর বা রূহানী জগৎ)

পরমস্থিতির জগৎ

"আর লোকেরা আপনাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন- "আত্মা আমার প্রভূর হুকুম।" (আল-কোরআন)

www.pathagar.com

(ঙ) মানুষের বিকীর্ণ শক্তির রূপ

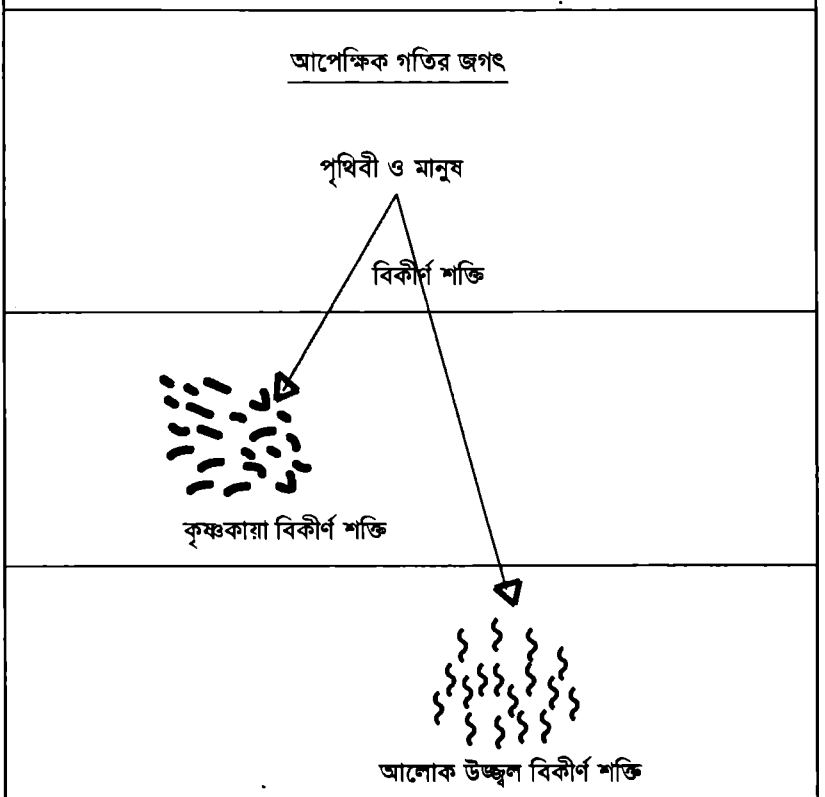

"(তাদেরকে সে দিনের ভয় দেখাও) যে দিন জমীন আসমানকে পরিবর্তন করে অন্যরূপ করে দেয়া হবে। তারপর সকলেই মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাতে পায়ে শিকল পরা এবং আরামহীন অবস্থায় হাজির হয়ে যাবে। সেদিন তোমরা পাপীদেরকে দেখবে আলকাতরার পোষাক পরিধান করে আছে। আর আগুনের লেলিহান শিখা তাদের মুখমণ্ডলের ওপর ছড়িয়ে থাকবে। এটা এজন্য হবে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেবেন। আল্লাহর হিসাব নিতে বিলম্ব হয় না।" (সূরা ইবরাহীম : ৪৮-৫১)

"সেদিন মানুষ সব কিছুই দেখবে যা তার দু'টি হাত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কাফের বলে উঠবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম।"

(সূরা নাবা: ৩৯,৪০)

www.pathagar.com

আপেক্ষিক গতির জগৎ-এর গতি থেমে যাওয়ার সাথে সাথে প্রথম ধাক্কা অনুভব হওয়া বা শুরু হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্ররাজিসহ আকাশ রাজ্যের সকল দৃশ্য, অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে শুরু হবে চরম সংঘর্ষ। এভাবে সংঘর্ষের শেষ পর্যায়ে সবকিছু ধুনা ধুনা হয়ে যাবে। এ পর্যায়েও চরম স্থিরতা আসবে না। তবু আবারও একটা ধাক্কা অনুভব হবে। অতঃপর বস্তু জগতের চরম বিলুপ্তির জন্য তরঙ্গগতি (অ্যান্টি কোয়ার্ক পর্যায়ের প্রতিবস্তুর কণা) ধেয়ে আসবে। অর্থাৎ বস্তুর মূল সত্তা কোয়ার্ক ও অ্যান্টি কোয়ার্ক-এর সংঘর্ষে তরঙ্গের ব্যতিচার ক্রিয়ায় শক্তি পুনঃবন্টন হয়ে যাবে।

আল্লাহ বলেন– "আর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন পৃথিবী ও আকাশ সমূহে যা কিছু আছে সব মরে পড়ে যাবে; তবে কেবলমাত্র তারাই জীবিত থাকবে যাদের আল্লাহ (জীবিত রাখতে) চাইবেন। তারপর দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে, তখন তারা সবাই আবার হঠাৎ উঠে দেখতে থাকবে।" (সূরা যুমার, আয়াত-৬৮)

আল কোরআনের অনেক উপমা, উদাহরণ রূপক অর্থের মাধ্যমে পেশ করে, তার ভাবার্থ বুঝে নিতে হবে। এখানে শিংগার ফুঁক তরঙ্গগতির সাথে সম্পর্কিত। মানব দেহের ক্ষেত্রে মনের নির্দেশে যেমন মস্তিষ্ক থেকে তরঙ্গগতি (Impulse) বা কমাণ্ড আদেশ (তথ্য তরঙ্গ) বের হয়ে অংগের কাজ (গতিশীলতা) কে নিবৃত্ত করে তেমনি স্রষ্টার আদেশে আরশের রজ্জু বেয়ে নির্ধারিত ফিরিশতা বা দূত [ইসরাফিল (আ)]-এর মাধ্যমে বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণাকেও ভাঙ্গাবার জন্য প্রতিবস্তুর পর্যায়ের অ্যান্টি কোয়ার্ক বা তরঙ্গগতি নিঃসৃত হবে। এই অ্যান্টি কোয়ার্ক তরঙ্গগতি বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণার সাথে ব্যতিচার ক্রিয়ায় শক্তির পুনঃবন্টনের মাধ্যমে বস্তু জগতের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ঘটাবে। তারপর দ্বিতীয় ফুঁক বা তরঙ্গগতির মাধ্যমে নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তন হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মহাবিশ্বের বস্তুজগতের গর্ভ থেকে যে সব "তথ্য কণা" বের হয়ে আকাশে ছড়িয়ে ছিল তাদের কি হবে? দুনিয়ার কর্মজীবনে মানুষের দেহকোষ থেকে প্রতিবস্তুর কণা বা তথ্যকণা যেমন বের হয় তেমনি অন্যান্য বস্তু থেকেও প্রতিবস্তুর কণা অহরহ সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে।

এসব প্রতিবস্তুর কণার মাধ্যমেই গড়ে উঠছে অ্যান্টি ম্যাটারের জগৎ (Anti Matter) বা প্রতিবস্তুর জগৎ। সে জগৎকে স্থির প্রতিক্রিয়ার জগৎও বলা চলে। এ অবস্থাটি কখন হবে? এর উত্তর নবী, রাসূল (সা)গণ যেমন

www.pathagar.com

সরাসরি বলেননি, তেমনি আল কোরআনেও নির্ধারিত কোন তারিখের উল্লেখ নেই। তাই অন্য মানুষের পক্ষে নির্ধারিত তারিখ বলা কোন কালেও সম্ভব হবে না। তবে আমরা বিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি, বস্তুর গঠন ও তার ধ্বংস লীলা ব্যাখ্যার মাধ্যমে কিয়ামতের একটা সম্ভাব্য ধারণা নিতে পারি। কিন্তু এ ধারণাটাকে চূড়ান্ত হিসেবে মনে করাও ঠিক নয়। বরং এটা একটা উপমা নির্ভর যুক্তি। নিম্নে সে উপমাটি তুলে ধরা হলো।

বস্তু জগতের চারটি মৌলিক কণা পরস্পরকে ধরে রেখেছে চারটি মৌলিক বলের মাধ্যমে। সেগুলো হলো–মধ্যাকর্ষণ বল, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক বল, সবল নিউক্লিয়ার ফোর্স ($১০^{-১৩}$) ও দুর্বল নিউক্লিয়ার ফোর্স ($১০^{-১৬}$) বা মরণ ফোর্স। অপরদিকে কণাগুলো হলো– প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো। এখানে চারটি কণা তাদের ভর (Mass)-এর আনুপাতিক বলের দ্বারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলের নাম মধ্যাকর্ষণ বল। অপরদিকে প্রোটন, ইলেকট্রনকে যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে সেটি হলো ইকেট্রো-ম্যাগনেটিক বল। আবার প্রোটন ও নিউট্রন সবল নিউক্লিয়ার চার্জ বহন করে। এগুলো যখন $১০^{-১৩}$ সেঃ মিঃ দূরত্বের কাছাকাছি আসে তখন তারা পরস্পরকে এই সবল নিউক্লিয়ার ফোর্স দ্বারা আকর্ষণ করে। অপরদিকে চারটি কণা যখন পরস্পর থেকে $১০^{-১৬}$ সেঃ মিঃ-এর কম দূরত্বে অবস্থান করে তখন দুর্বল নিউক্লিয়ার ফোর্স উৎপন্ন হয়। এই বলকে মরণ ফোর্সও বলা হয়। কারণ কণাগুলো যখন $১০^{-১৬}$ সেঃ মিঃ-এর কম দূরত্বে অবস্থান করে তখন তারা একে অপরকে ধ্বংস করতে থাকে। এর ফলে বিটা রেডিয়েশনের উদ্ভব ঘটে। এক্ষেত্রে দেখা যায় বস্তু ও প্রতিবস্তুর কণা একে অপরের সাথে দেখা হলেই তারা পরস্পরকে ধ্বংস করে।

এই মহাবিশ্বের আপেক্ষিক গতির জগতের (বস্তুজগতের) ধ্বংস বা প্রলয়কে বলা হয় কিয়ামাত। এটি কখন অনুষ্ঠিত হবে, এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। আমরা উপরের আলোচনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে কিয়ামাতের একটা সম্ভাব্য সময়ের ধারণা নিতে পারি। আমরা জানি এ মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল। মহাবিশ্বে অহরহ প্রতিবস্তুর জগতের সম্প্রসারণ হচ্ছে। কারণ বস্তু জগতের মানুষ ও অন্যান্য উপাদানের বিকীর্ণ শক্তিই হলো প্রতিবস্তুর কণা। এই কণার মাধ্যমেই প্রতিবস্তুর জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে দুনিয়ার আল মেহেদীর (বস্তু জগতের আমার দেহ) সাথে যদি প্রতিবস্তুর জগতের আল মেহেদীর দেখা

www.pathagar.com

হতো তাহলে তারা দু'জনেই দেহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে ধ্বংস করত। এটা বস্তু ও প্রতিবস্তুর কণার ধর্ম। এর সাথে মহাবিশ্বের আপেক্ষিক গতির জগতের ধ্বংস বা প্রলয়ের সম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে ধারণা করা হচ্ছে প্রতিবস্তুর জগৎ ডিমের মতো বৃদ্ধি হতে হতে যখন পরমগতির জগতের সীমানার কাছাকাছি চলে আসবে। তখন দুর্বল নিউক্লিয়ার ফোর্স-এর ন্যায় বস্তুর মরণ ফোর্স (Matter Killing Force) নামের এক ধরনের বস্তুকণা ধ্বংসকারী বলের উদ্ভব ঘটবে। এই বল বস্তুজগতের সকল জ্যোতিষ্কসহ বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণারও ধ্বংস ঘটিয়ে ভর ও শক্তির পুনঃবন্টন করে ভিন্ন চরিত্রে রূপান্তর করবে। সাথে সাথে আপেক্ষিক গতির জগতেরও মৃত্যু ঘটবে। অর্থাৎ তখন গতিশীল তথ্য তরঙ্গ (বস্তুর মূল উপাদান) স্থির তথ্য কণায় রূপ নিবে। বিশ্বের এ অবস্থাটার নামই কিয়ামত। কিয়ামাত অবস্থায় বস্তুসত্তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে। অতঃপর বিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়ম ও ভর শক্তি কিছুকাল স্থির (সুপ্ত) থেকে পুনরায় ভিন্ন রূপে জগৎ ও জীবের আবির্ভাব ঘটবে।

আল্লাহ বলেন– "এরপর একদিন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং আবার কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" (২০ : ১৫-১৬)

"আমিই তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি তাতে অসমর্থ নই যে, আমি তোমাদেরকে তোমাদের গঠন পরিবর্তিত করে দেব এবং তোমাদেরকে এমনভাবে গঠন করব যা তোমরা অবগত নও।" (৫৬ : ৬০, ৬১)

এ পর্যায়ে গতির জগতের বর্জ্য সত্তা ও আলোক উজ্জ্বল সত্তার জগৎ আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। অর্থাৎ জগৎ ও মানুষের কর্মের বিকীর্ণ শক্তির মধ্যে কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি ও আলোক উজ্জ্বল বিকীর্ণ শক্তি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। দুনিয়াতে যে সব মানুষের কর্মের বিকীর্ণ সত্তার মধ্যে (প্রতিবস্তুর তথ্যকণা) আলোক উজ্জ্বল বিকীর্ণ স্বভাবের সত্তা বেশী থাকবে তারা পাবে উজ্জ্বল সুখময় জগৎ। সে জগতের সুখ হবে অনন্ত অসীম। তথায় যখন যা চাওয়া হবে সেখানের বাসিন্দারা সাথে সাথে তাই পাবে। সেখানে কষ্টের লেশ মাত্র থাকবে না। অপরদিকে যাদের কর্মের বিকীর্ণ সত্তার মধ্যে কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি (কালো ধোঁয়ার ন্যায় সত্তা) বেশী থাকবে তারা হবে বর্জ্যসত্তার জগতের বাসিন্দা। সে জগৎ হবে কালো আলকাতরার ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ও যন্ত্রণাময়। সেখানে থাকবে অ্যান্টি ভাইরাস ও অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়ার মতো জীবাণু। মানুষের গঠন হবে

www.pathagar.com

টিউমার সেলের কাঠামোর ন্যায়। সে কারণে মানব দেহের বৃদ্ধি ক্রমান্নয়ে পাহাড়ের মতো হয়ে যেতে থাকবে। তাই ক্রমান্নয়ে যন্ত্রণাও বাড়তে থাকবে। এক সময় পাহাড়ের মতো দেহটা বৃদ্ধি হতে হতে বিষ্ফোরিত হয়ে যাবে। তারপর আবার নতুন দেহ সৃষ্টি হয়ে পুনরায় ছোট থেকে বৃদ্ধি হয়ে বড় হতে থাকবে। এভাবেই জাহান্নামের মৃত্যুহীন যন্ত্রণাময় জীব চক্র চলতে থাকবে। এটাই হলো মানুষ ও মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি।

বর্তমান আকাশে কত গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ ও গ্যালাক্সি রয়েছে তার হিসেব বলা কঠিন। আকাশ রাজ্যে কত বিচিত্র কাণ্ড যে ঘটছে তার ইয়ত্তা নেই। কোথাও গড়ে উঠছে সুশভিত জগৎ। আবার কোথাও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বিশাল বিশাল দ্বীপরাজ্য। এদের মধ্যে রয়েছে মানুষের কর্মের বিকীর্ণ সত্তার জগৎ। মানুষের পাপ কর্মের মাধ্যমে যে সব বিকীর্ণ সত্তার জগৎ গড়ে উঠে কখনো যদি কোন ব্যক্তি নিজ কর্মের জন্য অনুশোচনা করে আল্লাহর কাছে তওবা করে তবে তার পাপ সত্তাকে আল্লাহ ধ্বংস করে শক্তির পুণ:বন্টন করে দেন। এ প্রক্রিয়াটি ঘটে তরঙ্গের ব্যতিচার ক্রিয়ার মাধ্যমে। আবার কেউ যদি প্রাথমিক জীবনে ভাল কাজ করতে করতে পুণ্য জগৎ ভরপুর করে তোলে কিন্তু শেষ জীবনে ঈমানহারা হয়ে পাপ কাজে ডুবে যায় এবং এভাবেই মৃত্যু হয় তবে তার পুণ্য জগৎও ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবেই চলছে আকাশ রাজ্যে ধ্বংস আর সৃষ্টির খেলা।

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ যে দিন পরম গতির জগতের (স্রষ্টার নির্ধারিত সীমানার) কাছাকাছি চলে আসবে, তখন বিটা রেডিয়েশনের ন্যায় এক ধরনের বল ও রেডিয়েশনের উদ্ভব ঘটবে। এ ধরনের বল ও রেডিয়েশন বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণাকেও ধ্বংস করে দেবে। এই রেডিয়েশন "তথ্য তরঙ্গ"। শিঙ্গার শব্দ যেমন তরঙ্গের আকারে চলে তদ্রূপ এই রেডিয়েশনও তরঙ্গের আকারে চলে। তাই বলা যায় ইসরাফিল (আ) শিঙ্গার শব্দ এমনি (সম্ভবত) এক রেডিয়েশন পর্যায়ের বল। এই বলের মাধ্যমেই বস্তু জগতের সমাপ্তি ঘটবে। আবার নতুন (দ্বিতীয়) শব্দের মাধ্যমে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার নিয়ম চালু হবে। সে জগত প্রতিবস্তুর জগৎ। সেটাই হবে মানুষের কর্মের বিকীর্ণ সত্তার জগৎ।

www.pathagar.com

উপসংহার

মানুষ একেবারেই সসীম জীব। চারমাত্রিক ধারণার মধ্যেই তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাই জগৎ, মহাজগতের আদি উৎস তথা পৃথিবীতে আদমের আবির্ভাব সম্পর্কে মানুষের পক্ষ থেকে একশত ভাগ সঠিক ধারণা পাওয়া সহজ লভ্য নয়। তাই মানুষের বিশ্বাসে জগৎ ও আদমের আবির্ভাব সম্পর্কে রয়েছে বিচিত্র রকমের ধারণা। তার মধ্যে রয়েছে আদিকালের পৌরাণিক কাহিনী এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ঘাড়েও চেপে রয়েছে কুসংস্কার। অপর দিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রয়েছে ডারউইনের বিবর্তনবাদ। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদ সত্য হলে সকল মানুষের মধ্যেই থাকত শুধু পশুর স্বভাব। তারা পশুদের মতো উলঙ্গ হয়ে চলত। লজ্জা শরমের লেশমাত্র তাদের মধ্যে থাকত না। তাদের মধ্য থেকে পরিবার প্রথার বিলুপ্তি ঘটত। তবে এ ধরনের স্বভাব যে মানুষের মধ্যে নেই এমন নয়। আধুনিক মানুষ পশু শ্রেণীর মানুষ থেকে আবির্ভাব হয়েছে বলে তাদের মধ্যে এ ধরনের স্বভাব আছে বটে, কিন্তু সব মানুষই এমন নয়। যাদের পশু প্রবৃত্তি শয়তানের প্রভাবে খোদায়ী ইলমকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে গেছে, তারাই শুধু এ ধরনের স্বভাবের হয়ে থাকে। যা হউক আধুনিক মানুষ পশুর শ্রেণীর মানুষ থেকে উদ্ভব হলেও আদি মানব-মানবী ডারউইনের বিবর্তনবাদকে অনুসরণ করে উদ্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে আদমের আবির্ভাব হয়েছে স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন ধারায়, যা পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে পূর্ণতায় এসেছে।

সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি হলো "ধ্বনাত্মক তথ্য কণার" (positive information bit), অতঃপর তার থেকে "ঋণাত্মক তথ্য কণা" (Negative Information bit)সহ অন্যান্য তথ্য কণার উৎপত্তি ঘটে। অপর দিকে আত্মিক জগতের উৎস থেকে পর্যায়ক্রমে বস্তু জগতের সূক্ষ্ম উপাদানের উৎপত্তি হয়। পরবর্তি পর্যায়ে পানি থেকে একক প্রাণসত্তা বা এককোষী জীবের উদ্ভব ঘটে। সেই এক কোষী জীবের ডি.এন.এ. কোষে রয়েছে তথ্য কণার সমাহার। তারপর আদি এককোষী প্রাণীর

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেও কোষ বিভাজনের মাধ্যমে তার সত্তার থেকেই তার সঙ্গীনির উদ্ভব হয়। অতঃপর তাদের থেকে স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী সাংগঠনিক বিবর্তন ধারায় পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে পশু শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের থেকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আদম ও হাওয়ার আবির্ভাব ঘটে। এ বিষয়ে আদম ও হাওয়ার জন্ম রহস্য অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ হিসেবে আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক। অদৃশ্যে যা ঘটে সে সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। সে হিসেবে আদমের আদি উৎস সম্পর্কে আমাদের সকল যুক্তি, তথ্য আপেক্ষিক। আল্লাহ মহাজ্ঞানী। তিনি ছাড়া গায়েবের খবর বলা কারও সাধ্য নেই। কিন্তু আমাদের যুক্তি, তথ্য যদি কোরআন হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে বিশ্বাস করতে বাধা থাকার কথা নয়। তাই আসুন আমরা আদমের আদি উৎস সম্পর্ক পৌরাণিক কাহিনী ও ধর্মের ভেতরের কুসংস্কারপূর্ণ তথ্যের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে কোরআন ও হাদীসের গবেষণালব্ধ তথ্য গ্রহণ করি।

পরিশেষে আল-কোরআনের একটি সূরা থেকে নিম্নের দু'টি আয়াত উল্লেখ করে উপসংহারের ইতি টানা হলো। শেষ পর্যায়ে বলতে চাই সকল বিষয়েই আল্লাহই ভাল জানেন।

"বরং আল্লাহ তোমদেরকে উদ্ভূত করেছেন ভূমি হতে-উদ্ভিদের ন্যায়। অতঃপর তিনি উহাতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এবং তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে বের করবেন এক (নতুন) জাত হিসাবে।" (৭১ : ১৭-১৮)

www.pathagar.com

শেষ কথা

বিজ্ঞানের আবিস্কারেও শেষ বলতে কিছু নেই। আজ যা সত্য কাল তা মিথ্যাও প্রমাণিত হতে পারে। কিংবা মিথ্যা সত্যেও পরিণত হয়। আমি আদমের আদি উৎস সম্পর্কে কোরআন হাদীসের আলোকে যে তথ্য উপস্থাপন করেছি সেটাই শেষ কথা নয়। আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। আমার রয়েছে এ ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। সে হিসেবে আমি একজন মুসলমান। স্রষ্টা ও নবী (সা)-এর আনুগত্যই আমার জীবনের মূল লক্ষ্য। আমার আকাংখা ধর্মের ভেতরের কুসংস্কারসহ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক ব্যাখ্যার মূল উৎপাটন করে, বিজ্ঞান ও ধর্মের দিকে থেকে গহণযোগ্য সঠিক তথ্য তলে ধরা। আদমের আদি উৎস ও তাঁর দুনিয়ায় আবির্ভাব সম্পর্কে আমি যে তথ্য তুলে ধরেছি তা প্রচলিত ধারণার সাথে কিছুটা সাংঘর্ষিক হলেও কোরআন, হাদীসের গবেষণালব্ধ তথ্যের সাথে তার রয়েছে ব্যাপক মিল। তাই আমি আশা করি আমার গবেষণালব্ধ তথ্য প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক ধারণার উপর কোরআন ও হাদীসকে করবে বিজয়ী।

মানুষ হিসেবে আমার চিন্তা-চেতনায় ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। সে বিশ্বাস রেখেই বলছি, যদি কখনো আমার তথ্যে ভুল ধরা পড়ে, তাহলে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ আছি পুনঃসংস্করণে সকল ভুলের অবসান করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নেব।

আল্লাহর মহিমার কোন শেষ নেই। দৃশ্য জগতের চেয়ে অদৃশ্য জগতের গণ্ডি অনেক অনেক বেশী। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। তাঁর সৃষ্টির রেণু কণার গুণাগুণ বর্ণনা করে আমরা শেষ করতে পারব না। এ জগতের সকল কিছুই আল্লাহর আজ্ঞাবহ। তিনিই জগতকে অনস্তিত্ব (শূন্য) থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। শূন্য থেকে অস্তিত্বে আনা আল্লাহর অসীম প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ।

আদমকে তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন বিশেষ পরিকল্পনার মাধ্যমে। অতঃপর ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে এনে দুনিয়ায় উদ্ভব

www.pathagar.com

ঘটিয়েছেন। সে পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়ার নাম সাংগঠনিক বিবর্তন। সেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার সকল ব্যবস্থাপনাই আশ্চর্যজনক ও রহস্যময়। তবু সেটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অযোগ্য কিছু নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ আবিস্কার আমাদেরকে কোরআন বুঝা সহজ করেছে বিধায় আদমের দুনিয়ায় আবির্ভাব সম্পর্কে আমরা নতুন করে চিন্তা করতে পারছি। আল্লাহই একমাত্র সত্তা, যিনি প্রথম সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন। আবার পুনরায় সৃষ্টির ধারা চালু রাখেন। আমরা একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যাব।

"নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল (মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে তা তাঁহারই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি ইহাকে সৃষ্টি করবেন পুনরায়। ইহা তাঁর জন্য অতি সহজ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (৩০ : ২৬-২৭)

"(আল্লাহ) সেই একক সত্তা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাকে গঠন করেছেন সঠিক ও সুসম মাত্রায়। তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন সেই সুরত বা আকৃতিতে- যা তিনি ইচ্ছা করেছেন এবং তিনি তোমাকে সুসম্পন্ন করেছেন বিভিন্ন উপাদানে।" (৮২ : ৭-৮)

"(আল্লাহ) সেই একক সত্তা যিনি গঠন করেছেন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে এবং তা হতে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী।" (৪ : ১)

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১। তাফহীমুল কুরআন
২। হাদীসে কুদসী
৩। আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআন
৪। আল কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১, ২)
৫। কুর'আন কিয়ামাত পরকাল
৬। মানুষ ও মহাবিশ্ব
৭। সৌভাগ্যের পরশমণি
৮। কোরআন এবং জেনেটিক্স
৯। মানুষের আদি উৎস
১০। বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম
১১। মহাবিশ্ব মেরাজ ও বিজ্ঞান
১২। কোরআন মুহাম্মাদ (সা) বিজ্ঞান
১৩। পদার্থ বিজ্ঞান
১৪। জীব বিজ্ঞান
১৫। মাসিক মদীনা
১৬। দৈনিক সংগ্রাম
১৭। ইসলামী দর্শন
১৮। মরণের আগে ও পরে
১৯। মৃত্যু যবনিকার ওপারে
২০। সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য
২১। আদম ও শয়তান
২২। আধুনিক বিজ্ঞান।

www.pathagar.com

পলাশ পাবলিকেশন

ISBN 984-32-0908-7

www.pathagar.com